নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ

জগদীশ গুপ্ত

এক

কচি শিশুটি দিবারাত্র অবিরাম মুষ্টি বাঁধিয়াই রাখে। মুষ্টির ভিতর কিছুই থাকে না, স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই না—তবু মনে হয়, পৃথিবীর জীবনের আকাশ-ময় আর আশ্বাসময় নির্য্যাসটুকু, সে যেন ঐ মুষ্টির ভিতর লুকাইত রাখিয়াছে। শশধরের যখন শশধর নাম হয় নাই, আর, মুষ্টি বাঁধিয়া ঘুমাইত কেবল, তখন তার ঠাকুমা কৈবল্য-দায়িনীর ঐ রকম মনে হইত। শিশুর মুষ্টির ভিতর কিছুই নাই—ধন-রত্ন কি স্বর্গ মোক্ষ কি কোনো অবদান কি উপঢৌকন লইয়া সে আসে নাই, তবু ঠাকুমা মনে করেন, মানুষের যা' কাম্য সবই আছে উহার ভিতর—দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। দিনের কয়েক-বারই কৈবল্য ছেলেটির মুষ্টি খুলিয়া দেখেন - রক্ত টক্‌টক্ করিতেছে—দেখিয়া তাঁর করুণা জন্মে···ছল্‌ছল্ প্রাণে তিনি মুষ্টিটী চুম্বন করেন।

শিশুর নিমীলিত চক্ষু, আর বুকের ভিতর যে জীবনধারা চলে, বাহিরে তার নৃত্যপরায়ণ ঢেউগুলি—ইহা দেখিয়াও ঠাকুমার মনে

হয়, রথে রাম দর্শন ঘটিতেছে—এই মূর্ত্তির উপভোগ্যতার শেষ নাই।

কৈবল্য-দায়িনী অপরিসীম লালসা ভরে পৌত্রটিকে মানুষ করিবার ভার লইলেন—তাঁর শুচিজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, এবং শশধরের গর্ভধারিণীকে যেন স্তন্য দিবার পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন···ছেলের সম্পর্কে মায়ের আর কোনো কাজ রহিল না।

বৃদ্ধ বয়সে যখন পরকাল খুব নিকটবর্ত্তী মনে হয় তখন ইহকালে সদ্যঃ আগত শিশুকে স্পর্শ দিয়া আবৃত করিয়া রাখিতে খুব বেশী পরিমাণে লোলুপতা জন্মে কি না কে জানে। শিশু উষ্ণ কোমল; বৃদ্ধ শীতল কর্কশ, শিশুর গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধের গায়ে সংক্রামিত হইয়া আরাম ও আনন্দ জাগায় বোধ হয়—বৃদ্ধ নিজেকে সঞ্জীবিত মনে করে।···সবার উপর, সুদের প্রতি মমতা—নাতি নাকি সুদ; তার একবিন্দু রক্তের সঙ্গে সংসারের সমগ্র সত্তা জড়াইয়া আছে।

অন্নপ্রাশনে তুমুল ঘটা করিয়া ঠাকুমাই শশধরের নাম রাখিলেন শশধর।

এই শশধরই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ।

দুই

কতদিনের আয়ু লইয়া পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল তাহা যখন অনুমান করা যায় না, তেমনি অনুমান করা যায় না যে, এই জাতক উত্তরকালে ভীরু হইবে কি বীর হইবে, মূর্খ হইবে কি বিদ্বান্ হইবে, দরিদ্র হইবে কি ধনী হইবে। ভবিষ্যৎটা সমগ্রভাবে অন্তরালে থাকায়, এবং কোনো দিকে ছিদ্র নাই বলিয়া তার ছায়া সম্মুখে না আসায়, অসন্তোষজনক এই অসুবিধাটা ঘটে। তবু যদি বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ গঠনের এবং ভাগ্য ব্যবস্থাপনের ক্ষমতা, দৈব ব্যতীত, মানুষের হাতেও খানিকটা আছে তবে ভুল বলা হইবে না।...প্রহ্লাদের হরিপরায়ণতা একেবারে সহজাত—দৈত্য-কুলকে তিনি সহজ প্রবৃত্তির দ্বারাই উল্টাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু চর্চ্চার দ্বারা এবং শিক্ষা সদুপদেশের সাহায্যে মানুষ ধর্ম্মজগতে উল্লেখযোগ্য আসন পাইয়াছে, এ-দৃষ্টান্তও আছে। সজ্ঞান যে নিয়ন্ত্রণ তারই মূল্য অধিক, ইহা স্বীকার করিতে হ'বে; এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেইটাই দুর্ল্লভ। পক্ষান্তরে সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিবার বেলায় অজ্ঞানতার দ্বারা যে নিয়ন্ত্রণ ঘটে তাহাই সুলভ, তারও প্রভাব চিরস্থায়ী এবং সতেজভাবে কার্য্যকর।

মানুষ করিবার কায়দার দোষে কত ছেলের মাথা-খাওয়া গেছে তার ইয়ত্তাই নাই—যাদের গেছে শশধর তাদেরই একজন।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিল—

আনন্দ করো, আপত্তি নাই; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, শুভক্ষণে করিল কি অশুভক্ষণে করিল, তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা দৃষ্টে তার বিচার করা ভুল; জীবন-কথা আলোচনার পর তার বিচার হওয়াই উচিত—কারণ, জীবনে শুভাশুভ কেবল জন্মক্ষণের উপর নির্ভর করে না—মানুষের হাত তা'তে থাকে।

ছেলে হইল সুন্দর—ঠাকুমা তার নাম রাখিলেন শশধর অর্থাৎ ছেলে দেখিয়া তার কান্তির ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ জুড়াইয়াছে। ·· স্নেহের প্লাবনে পড়িয়া তিনি ওলটপালট খাইতে লাগিলেন—ছেলেকে তার মায়ের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাকে মানুষ করিবার ভার লইলেন ভারি তৃপ্তি আর আগ্রহের সঙ্গে। · শশধর নামটা পুরাতন আমল বলিয়া মনে হইলেও কেহ প্রকাশ্যে আপত্তি করিল না—ছেলের ঠাকুমার হাতে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেও কেহ আপত্তি করিল না।

শিশু শশধর খানিক্ সজ্ঞানতা লাভ করিয়াছে। এখন সে একেবারে অনড় নয়—হাত পা ছুড়িয়া বিছানার উপর যে চমৎকার ভঙ্গীতে আর ভারি চঞ্চল অবয়বে থল্‌বল্ করে। তাহার চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে সোলার রঙিন খাঁচা একটা তার

দৃষ্টির সম্মুখ ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে···সেটা সত্যই আনন্দপ্রদ হইয়া তার চোখে পড়ে কি না তা' কেউ জানে না—

কিন্তু ইহা একেবারে অকাট্য নিঃসন্দেহ ব্যাপার যে, ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাইয়া সে হাসে···

হাসি দেখিয়া ঠাকুমা চমৎকৃত হইয়া যান্, এবং যত হন্ চমৎকৃত, তার দ্বিগুণ হন বিগলিত; তাঁর মনে হয়, তাঁহাকে সে চিনিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে মধুর সম্পর্কটা আর নাড়ীর টান্ শিশু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে—তার দৃষ্টিতে আর হাসিতে পরিচয়ের আনন্দ প্রাঞ্জল হইয়াই দেখা দেয়···

তা' হইবে না কেন! রক্তের টান ও-র রক্তেই আছে—তাহাই সে অবিকশিত চেতনার ভিতরেই অনুভব করে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগে কোথায় তা' যেমন ধরা যায় না, কিন্তু শুনা যায় যে, জাগিয়া সাড়া দিল—এ-ও ঠিক্ তেম্‌নি···

ঠাকুমা চট্ করিয়া যাইয়া ব্যাপারটা শশধরের মা-কে জানাইয়া আসেন। শশধরের মা তিলোত্তমারও তা'তে সন্দেহ থাকে না—সম্পর্ক টের পাইবে না, এ-ও কখনো হয়!···শশধরের বাবা শ্রীধরও তাহা শুনিয়া অবাক্ হন্—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার ঘটিতেছে, দৃষ্টির অগোচরে, মনের ও জ্ঞানেরও অগোচরে ঘটিতেছে; সেই রকমই সূক্ষ্ম একটা বিষয় ইহা হইতেও পারে!

এর উল্লসিত আবহাওয়ার ভিতর ঠাকুমার হাতে আমাদের

এই শশধরের গঠন কার্য্য শুরু হইল—এবং তাঁহার সহায় হইলেন দৈব। ঠাকুমা হাত বাড়াইয়াই গঠন কার্য্যে হাত দিলেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শুভ কার্য্য তিনি কিছু করিতে পারিলেন না—সে প্রতিভা তাঁর নাই—তিনি তার বরং অনিষ্ট করিলেন। কৈফিয়ৎ চাহিলে ঠাকুমা হয়তো কাঁদিয়া ফেলিবেন; হয়তো বাঁশের খুঁটিতে কপাল ঠুকিয়া রক্তাক্ত হইবেন, এবং বলিবেন, এ-কথাও আমায় শুনতে হ'লো!...কিন্তু অবুঝ সাজিয়া ঐ সব কাণ্ড কেলেঙ্কারি করিলেই যদি ক্ষমা পাওয়া যাইত তবে ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইন বহু পুর্ব্বেই বাতিল হইয়া যাইত, পাপীকে নরকের ভয় দেখান' হইয়া উঠিত হাস্যকর এবং যে-ব্যক্তি মানুষের মন ভাঙিয়া দেয় তারই বাড়িত মান।

সে যা-ই হোক, সে পরের কথা: এখনকার কথা এই যে, শশধর বড় হইতেছে...

সে কোলে চাপে ঠাকুমার, কাছে শোয় ঠাকুমার, গল্প শোনে ঠাকুমার মুখে, আব্দার করে ঠাকুমার কাছে, মা বাপের ধমক্ খাইয়া সে চোখের জল মুছিতে আসে ঠাকুমার অঞ্চলে...

ঠাকুমা শিখাইয়া দিলেন—শশধর মাকে বলিল দুষ্টু-মা, ঠাকুমাকে বলিল দিদি।

ইহাতে ক্ষতির কারণ কিছু নাই—ঠাকুমার মুখের কথা শশধরের সব চাইতে বিশ্বাস্য, আর সব চাইতে মিষ্ট আর স্পষ্ট মনে হইবে ইহাতেও ক্ষতির কারণ কিছু নাই—হউক; বিস্মিত হইবারও কিছু নাই।

কিন্তু ক্ষতির কারণ দেখা দিল খুবই নির্দোষ আকারে—ঠাকুমার হাসি-মাখা মুখের কথায়…

শশধর বড় চঞ্চল—তিন বছর বয়সেই সে দুরন্তের একশেষ। ঠাকুমা তাহাতে খল্‌খল্ করিয়া হাসেন…খুব আজগুবি আর আনন্দপ্রদ মনে হয়, তিনি ঐ উপলক্ষেই বারকতক পাড়া বেড়াইয়া আসেন…কখনো তাকে ধমক্ দেন; কখনো হাত ধরিয়া তুলিয়া আছাড় দিবার ভয় দেখান্; বলেন, একেবারে মেরে ফেল্‌লে হয়রাণ করে! কোথাকার বাঁদর তুই!

শশধর বলে, তোমার ঘরের।

সে যা'-ই হোক্, শশধরকে কোলের কাছে চুপটি করিয়া বসাইয়া রাখিতেই ঠাকুমাকে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, কিন্তু তা' না রাখিলেই নয়। শশধরকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখা একাধিক কারণে তাঁর দরকার—তাঁর তা' ভাল লাগে; মনে হয়, যতক্ষণ যতটা নিবিড়ভাবে কাছে সে থাকে ততক্ষণই স্পর্শ সুখ তত চরম করিয়া তাকে পাওয়া হয়…

আর একটা কারণ তাকে আবদ্ধ রাখা; কারণ, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর দৃষ্টির বাহিরেই নাকি যাবতীয় শত্রু বিচরণ করে।

শশধরকে কোলের কাছে বসাইয়া রাখার একটি নির্ব্বিশেষ উপায় আছে—সেটি হইতেছে মজার মজার গল্প শুনান।

অসীম স্নেহভরে শশধরের গায়ের ধূলা মুছিয়া দিয়া তিনি তাকে কোলের ভিতর টানিয়া রাখেন, আর, গল্প বলেন—বেশীর ভাগ সন্ধ্যাবেলাতেই সেটা তিনি করেন; কারণ, আসন্ন সন্ধ্যা সম্বন্ধে

তাঁর নিজের মনেই অকল্যাণের কেমন একটা ছম্‌ছম্‌ ভয়ের ভাব আছে—আর তাঁর মত, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর বাহিরে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ান অত্যন্ত বেল্লিকের কাজ।

ঠাকুমা বলেন, সন্ধ্যেবেলায় কোথাও বেড়িও না, ভাই! জানো না তাই ছুটে যাও।...ভূত প্রেতগুলো ঠিক্ তখনই সব গাছ থেকে আকাশ থেকে মাটিতে নামে—ঘুরে' ঘুরে' বেড়ায়, মানুষের শরীরে ঢুকতে চায়—একটু অসাবধান এদিক্ ওদিক্ হলেই ঢুকে' পড়ে। তাকেই ত' বলে ভূতে ধরা।

ইহা তাঁর ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, তাঁর মনেরই কথা এবং খাঁটি বিশ্বাস বলিয়াই ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির যন্ত্রণা ও নির্লজ্জ আচরণ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া তিনি শিহারতে থাকেন।...একটি বৌকে শ্বশুরের ভূতে পাইয়াছিল। সেই অবস্থায় স্বামীকে পুত্র সম্ভাষণ করিয়া বৌ-টি যেসব কথা উচ্চারণ কীর্ত্তি কলাপ করিয়াছিল তাহা যেমন অশ্রাব্য তেম্‌নি করুণ।...সে ঘটনাটাও ঠাকুমার মনে পড়ে।

শশধর জিজ্ঞাসা করে, ভূতে ধরলে কি হয়?

—ভাঁরি কষ্ট পায়। ভূতে তাকে আছড়ায়, যা' তা' খাওয়ায়, রাত্রে ঘুমুতে দেয় না; এমন কি পুকুরে নিয়ে ডুবিয়েও মারে।

ঠাকুমা জানেন, পুকুরে—ডুবে মরা একটি লোকের ভূত তার জীবিত কালের এক প্রতিবেশীকে আশ্রয় করিয়াছিল—তাকে জলে লইয়া ফেলিয়াছিল, ডুবাইয়া রাখিয়াছিল এবং না মরা পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই।

শশধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, ভূত কারা হয়?

—যাদের গতি হয় না তারাই ভূত হয়। দোষের সময় যারা মরে তাদের গতি হয় না—ভূত হ'য়ে গাছে গাছে বেড়ায়।

শুনিয়া শশধর আড়ষ্ট হইয়া যায়; ভাবে, দোষের সময় যেন না মরি।...জিজ্ঞাসা করে, ভূত দেখেছ কখনো?

শুনিয়া ঠাকুমা ভাবেন, এ জন্মে ত' দেখি নাই। কিন্তু দেখি নাই বলিলেই দুরন্ত ছেলে দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে এবং কি অনিষ্ট ঘটাইয়া বসিবে তার ঠিক নাই...

বলেন, দেখেছি বৈ কি।

—কোথায়?

—এখানেই।

—কেমন দেখতে?

—কদাকার।

বলিয়া এক কথায়, মাত্র কদাকার শব্দটি ব্যবহার করিয়া, তিনি ভূতের রূপ-বর্ণনা অপ্রচুর ভাবে শেষ করেন না—আরো বাড়াল...ভূতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপের পরিচয় তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেন...তার চুলের, মাথার, চোখের, নাকের, কানের, দাঁতের, হাতের এবং আঙুলের আর নখের যে বেপরোয়া বর্ণনা তিনি দেন, মানুষের চেহারার সঙ্গে তার খুবই গরমিল, তা খুবই ভয়াবহ, আর তার প্রতিবাদ নাই।...আরও সঙ্কট এই যে, ঠাকুমা শশধরকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিল, ভূতগণ সংখ্যায় অগণিত, এবং তারা পৃথক পৃথক আকারে বৃক্ষে এবং শূন্যে বিন্যস্ত থাকিলেও

তাদের সাধারণ ধর্ম্ম, নাকি-সুরে কথা বলা আর অনিষ্ট প্রবণতা, একই রকম।

শশধর জিজ্ঞাসা করে, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।···তবে শোন একটা গল্প। বলিয়া সুরু করিয়া ঠাকুমা জানিতে চায়, ভয় পাবেনা ত ?

ভয়ে চোখ বুজিয়া শশধর বলে, না।

—তবে শোন।

একবার এক ঠাকুর যাচ্ছিল বনের ধার দিয়ে ভিন গাঁয়ে তার জামাইয়ের বাড়ী।···মাঠে মাঠে পথ ত'। কিন্তু মাঠের ঠিক্ মাঝখানে আস্‌তেই তার সন্দেহ লাগল'। তেপান্তর মাঠ—চারিদিক শূন্য। ওদিকে পশ্চিমে মেঘ লেগে গুর্ গুর্ করে' ডাক্‌তে লাগল ঘন ঘন! বামুন ত' ভয়ে অস্থির। সে আবার শুনেছে, এই মাঠে ভূতের উপদ্রব আছে।···তবু সে যাচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি, আর মনে মনে রাম নাম জপ করছে···

শশধর জানিতে চাহিল, রাম নাম জপ করলে কি হয় ?

—ভূত এগুতে পারে না।

—তারপর ?

—তারপর খানিক বাদেই ঠাকুর দেখতে পেলে, সে যে দিকে যাচ্ছে, সেই দিকেই আর একটা লোক যাচ্ছে, সাম্‌নে সাম্‌নে। ঠাকুরের তখন সাহস হ'ল যে, একটা সাথী পাওয়া গেল। কিন্তু

সাথী ত' সে নয়—যাদের ভয় ঠাকুর করছিল তাদেরই সে একটি!

—ভূত?

—সন্ধ্যেবেলা নাম করতে নেই।…হ্যাঁ, তাদেরই একটি। গাছ থেকে নেমে এসেছে।

—তারপর?

—তারপর, ঠাকুর ত' তা' জানে না—সে ডাক্‌ল, ওগো কে যাচ্ছ, দাঁড়াও; এক সঙ্গে যাই গল্প করতে করতে…কিন্তু সে তা' শুনবে কেন? তার মৎলব খারাপ।

—কার?

—সেই ইয়ের।

—তারপর?

—তারপর, যাচ্ছেই, যাচ্ছেই, দু'জনাই যাচ্ছে—ঠাকুর যতই ছোটে, সাম্‌নের লোকটার নাগাল আর সে পায় না।…ততক্ষণে সন্ধ্যে আরো ঘোর হ'য়ে এসেছে।…যেতে যেতে হঠাৎ ঠাকুর দেখল, সাম্‌নের লোকটার পা দুটো মাটির সঙ্গে ঠেকে নাই—মাটির আধ হাত উপর দিয়ে সে যেন ভেসে চলেছে—পা উঠছে না, নাম্‌ছে না।…তখন ঠাকুর বুঝতে পারল, ও ত' মানুষ নয়, কোনো অপদেবতা হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কি হবে—ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়ে' ঠিরঠির করে' কাঁপতে লাগল—অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আর কি!…এমন সময় তার

মনে পড়ে' গেল গাইত্রীটা। বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে সে চেঁচিয়ে গাইত্রী বলতে লাগল'…ওটা তখন তফাৎ থেকে নাকিসুরে বললে, যাঁ, বেঁচে গেঁলি এঁবার। বলে' প্রকাণ্ড হ'য়ে যেন মিলিয়ে গেল।

শশধর বলে, বাবা।…তারপর জিজ্ঞাসা করে, আমাদের পৈতে নেই, ঠা-মা?

—না, ভাই; আমরা যে কায়েৎ!

শুনিয়া শশধর দিশেহারা হয়—পৈতার অভাবে অনুরূপ অবস্থায় সে নিস্তার পাইবে না, ইহাই ভাবিয়া তার বুক কাঁপে।…জিজ্ঞাসা করে, গাইত্রী মনে না পড়লে ভূত কি করত?

—ঘাড় মটকে তাজা রক্ত খেত বামুনের।

প্রবহমান রক্তের ধারা কল্পনা করিয়া ক্ষুদ্র বালক শশধরের আতঙ্কের অন্ত থাকে না…গায়ত্রীটা শিখিয়া রাখিবার এবং সন্ধ্যার সময় বাহিরে আসিবে না সঙ্কল্প করে।…জিজ্ঞাসা করে, শেয়াল কেন ডাকে, ঠা-মা?

ঠাকুমা বলেন, মড়া খায় আর ডাকে। সেই মড়া-গুলোই ত' ভূ—ইয়ে হয়; বিজন বনে আর শ্মশানে থাকে তারা।

শুনিয়া শশধরের কল্পনার দৃষ্টি খুলিয়া যায়; দেখে, শৃগালে মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, আর তাহারই প্রেতাত্মা বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে…

ঠাকুমার কোলের ভিতর প্রাণপণে মাথা গুঁজিয়া দিয়া শশধর ত্রিভুবন অন্ধকার এবং বীভৎস দেখে।…স্নায়ু তার যে সজীবতা লাভ করে দিনের ক্রীড়ায়, আনন্দ কলরবে, সন্ধ্যার সময় ঠাকুমা তা' নির্জ্জীব শিথিল পীড়িত করিয়া দেন অমানুষিক গল্প বলিয়া, ত্রাসের আঘাতে আঘাতে অস্বাভাবিকভাবে জর্জ্জরিত করিয়া।

যদি মনে করা যায়, ঠাকুমার ঐ একটি গল্পই সম্বল, আর তিনি ঐ একটী গল্পই বারংবার বলেন তবে ভুল হইবে। তিনি বহুস্থান দর্শন করিয়াছেন, বহুলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছেন সুতরাং তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত না হইলেও প্রকাণ্ড নিশ্চয়ই। এই প্রকাণ্ড ভাণ্ডার হইতে তিনি গল্প-রস পরিবেশন করেন—ক্লান্ত তিনি হন্ না। ঠাকুমা একবার কাশীধামে গিয়াছিলেন—সেখানে সসঙ্গী তিনি দৈবাৎ যাইয়া উঠিয়াছিলেন যে-বাড়ীতে সেই—

ঠাকুমার কাছে সন্ধ্যার সময় বসিলেই শশধরের মনে ভূতের কথাটাই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া উপস্থিত থাকে, ক্ষুধার সময় খাদ্যের প্রতি লোভের মত -

সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে, ভূত ছিল।

—উঁহুঁ। সেই বাড়ী থেকে সাত আটটা বাড়ী তফাতের একটা বাড়ীতে। ভারি উপদ্রব করত।…বলিয়া উপদ্রবের প্রসার পরিমাণ তিনি বাড়াইয়া বাড়াইয়া বলেন—বাড়াইয়া বলার কৃতিত্বের পুলক তাঁর উপরি লাভ।

শশধর কান পাতিয়া তা' শোনে...ভয়ে শেষ হইয়া যায়, শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যেন, তবু কষ্টের ভিতরেই কেমন একটা আনন্দে সে উৎসুক হইয়া থাকে।

ঠাকুমা বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন—সেখানকার ব্যাপার আরো অদ্ভুত। বৃন্দাবনে যত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেহই বৃক্ষ নহে—বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া পদস্খলিত বৈষ্ণবগণ বিদ্যমান...দিনে তাঁরা বৃক্ষ, কিন্তু গভীর রাত্রে তাঁরা মানব কলেবর ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, অবগাহন স্নান করেন; তর্ক বিতর্ক, সাধুদর্শন, শাস্ত্রালোচনা করেন; এমন কি পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁরা হরিনামে মাতোয়ারা হন, এবং কীর্ত্তন ও নৃত্য করেন...কিন্তু উষার প্রাক্কালেই তাঁরা যে বৃক্ষ সেই বৃক্ষ—রজে ধূসরিত হইয়া নিজের নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন!

শশধর জিজ্ঞাসা করে, আমাদের কাউকে যদি তারা তখন দেখে ত কি করবে?

—মেরে' ফেল্‌বে, কিম্বা যে দেখ্‌বে সেই মরে যাবে তৎক্ষণাৎ।

বৈষ্ণবগণের প্রেতাত্মারও এই হত্যা-প্রবৃত্তি দেখিয়া ভৌতিক সেই সাংঘাতিক রহস্যে শশধর আরো ঘাব্‌ড়াইয়া যায়—নিস্তার নাই কোনোদিকেই—ওরা সবাই সমান, মারিয়া ফেলিতে ভারি রাজি!

শশধর ঠাকুমার কোলের কাছে শুইয়া রাত্রে ঘুমের ঘোরে

মাঝে মাঝে গুমরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে···তখনই চুপ করিয়া যায়··· ঠাকুমা তা' টের পান্, কোলের ভিতর শশধরকে আরো খানিক্ টানিয়া লন, কিন্তু তার কাঁদিয়া উঠিবার কারণটা কি তা' তিনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না। শশধর স্বপ্নে ভূত দেখে।

তিন

শশধর আরো খানিক্ বড় হইয়াছে।

শ্রীধর একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, তোমার নাতিকে এইবার কিছুটা কোল ছাড়া করতে হবে।

—কেন? কৈবল্যদায়িনী চম্‌কিয়া উঠিলেন।

—ইস্কুলে পাঠাব মনে করেছি। ঠাকুরমশায় দিন দেখে দিয়েছেন—পরশু ভাল দিন আছে।

বছর দেড়েক আগে যথারীতি হাতে খড়ি দিয়া সরস্বতী পূজার দিন হইতে শশধরের বিদ্যার্জনের সূত্রপাত হইয়াছে।—বিদ্যা-দায়িনীর পৃথিবীব্যাপী জ্যোতিঃ পরিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে

বলিয়া চন্দনের ফোঁটা কপালে লইয়া সে পা বাড়াইয়াছিল তার-পর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শ্রীধরের অক্লান্ত সাহায্যে অত্যন্ত মন্থর গতিতে উত্তীর্ণ হইয়া এখন সে পাঠশালায় যাইবার উপযুক্ত হইয়া আছে...

কৈবল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে পড়া শেষ হলো?

—হলো ঠিক্ নয়, আরো কিছুদিন চলতে পারে। কিন্তু ইস্কুলে যাওয়ার অভ্যাসটা এখন থেকেই করাতে হবে।...তারপর হাসিয়া বলিলেন, তুমি এ-কাজটা পারলে বেশ হ'ত, নয়, মা?

কৈবল্যও হাসিলেন; বলিলেন, আমরা খালি গু ঘেঁটে মানুষ করতে পারি—আমরা কি ওই সব পারি!...তা' দেও, লেখাপড়া শিখ্‌বে বই কি।

ঠাকুমা শশধরকে কয়েক ঘণ্টা ছাড়িয়া থাকিতে নির্ব্বিবাদে সম্মত হইলেন। জানি বলিয়া কি পারি বলিয়া যখন তখন অপর যে-কোনো—কাজের কথায় লাফাইয়া উঠা যাইতে পারে, বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে তা' সম্ভব; কেবল এই কাজের বেলায় তা' অত সহজে পারা যায় না—অনেকেই তা' পারে না। ঠাকুমা ত' তা' পারেনই না; কিন্তু ছেলের হিত তিনি প্রাণপণেই চান্।...নাতিকে অতবড় করিয়া তুলিয়াছেন—এখন সে তাঁরই হাতে সেবা যত্ন আদর কদর পাইতে পাইতে কৃতবিদ্য হোক্। অদর্শনের কষ্ট আর দুর্ঘটনার আশঙ্কা সহ্য করিতেই হইবে।

ঠাকুমা-ই তাহাকে স্নান্ করান্, আহার করান্, জামা কাপড়ে সাজান্, চুল পরিপাটি করিয়া দেন, হাতে বই তুলিয়া দেন, ঝিয়ের

সঙ্গে শশধর পাঠশালায় রওনা হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া যাইয়া তাকাইয়া থাকেন; দেখেন, ওরা ঠিক মত যাইতেছে কি না; এবং মাঝে মাঝে গরু ঘোড়া গাড়ী কুকুর প্রভৃতি বিপজ্জনক জীবজন্তু বস্তু সম্বন্ধে এমন ভয় দেখাইয়া দেন যে, শশধর কিছুক্ষণ কাবু হইয়া থাকে…

দুরন্ত শিশুকে কেমন করিয়া চালিত করিয়া লইয়া নিরাপদে পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিতে হয়, সে-বিষয়ে ঠাকুমার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ঝি মনে মনে প্রায়ই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু পরম সুখের কথা এই যে, শশধর নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে করিতে যাতায়াতে পরিপক্ক হইয়া উঠিল…তারপর পাঠশালা ছাড়িয়া সে গেল হাই ইস্কুলে…

এবং সেখানে পড়িবার সময় ঘটিল আর এক কাণ্ড।

চার

মা সরস্বতীর সেবা শশধর কিরূপ নিষ্ঠার সহিত আর আনন্দনীয়ভাবে সম্পন্ন করিতেছে তাহা গোপন রাখাই ভাল—সে-ব্যাপার ভাল নয়। যতবার প্রোমোশন পাইয়াছে তার একবারও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে, অর্থাৎ সব বিষয়েই পাশ করিয়া, সে পায় নাই।

শশধর এখন বেশ বড় হইয়াছে, তের বছরের; কিন্তু ভূতের ভয় তার যায় নাই।...আকাশ যখন দিনান্তে অন্ধ হইয়া আসে আর মৃত্তিকাসংলগ্ন বহুদূরবর্ত্তী দিগন্ত-বৃত্ত কুঞ্চনে আবিল হইয়া যেন ক্রমাগত তাহারই শরীরের দিকে ঝুঁকিয়া আসিতে থাকে তখন শশধর নির্জ্জন মাঠে ময়দানে একা তিষ্ঠিতে পারে না—তার গা ঘেষিয়া ভূতের আগমন যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সে অনুভব করে—দেখা দেয় নাই, কিন্তু দিতে উদ্যত।...শশধর তাড়াতাড়ি পালায়, মানুষের সঙ্গ ধরে, আর তখন মনে মনে হাসে...রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দূরে শৃগাল ডাকিতেছে শুনিলে তার অত্যন্ত ভয় করে। বুক ছাৎ করিয়া তার মনে পড়ে, শৃগাল মৃতের মাংস ভক্ষণ করে; দূরে উচ্চকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি করিয়া তাহারা তা'-ই করিতেছে—তাহারা মৃতের সন্ধান পাইয়াছে।

দুঃখের বিষয় ইহা নিশ্চয়ই যে, ঠাকুমা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি যা' রাখিয়া গেছেন তা' শশধরের পক্ষে অত্যাজ্য স্নেহের স্মৃতি আর গল্পগুলি ; তাঁর গল্প বলা সার্থক হইয়াছে।

ঐ গেল এক রকম। অদৃশ্য জগতের এবং সন্দেহের ব্যাপার ওটা, যদিও শত্রু। কিন্তু মানুষের দেহ আর প্রাণ লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মান্তিক কত আয়ুধ যে হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টির ঠিক্ উপর দিয়া প্রতিনিয়ত ছুটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রেলের গাড়ী সেই জ্বলন্ত হিংস্র বস্তুর একটি—অত্যন্ত বেগবান্ যেন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতে চায়। এই গাড়ী সময়-বিশেষে বিশেষ করিয়া অনিবার্য্য হইয়া ওঠে, এবং তাহার নীচেয় চাপা পড়িলে সন্দেহই থাকে না যে মরিলাম।

এই গাড়ী কী বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করিতে পারে, ভূতের ভয়গ্রস্ত শশধর একদিন তা' স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল···

ইস্কুলের ছুটির পর দল বাঁধিয়া শশধর বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় ছেলেদের কাণে জনরব পৌঁছিল যে, রেলের গাড়ীর নীচেয় পড়িয়া একটি লোকের পা কাটা গেছে—ষ্টেশনের ধারেই।···বহু লোক সেই দৃশ্য দেখিয়া কলরব পূর্ব্বক আলোচনা করিতে করিতে ফিরিতেছে, এবং সবাই বলিতেছে, লোকটা বোকা এবং গ্রাম্য ; নতুবা গাড়ী ধরিবার ব্যগ্রতায় চলন্ত গাড়ীরই সম্মুখে যাইয়া অমন করিয়া রেলের উপর সে উঠিবে কেন ?

দৌড়াইয়া যাইয়া দেখিবার মত আর কৌতুকপ্রদ দৃশ্য সেটা যে নয়, ছেলেমানুষ শশধরের তা' আদৌ মনে হইল না···সেই দৃশ্য

দেখিবার আগ্রহ সে দমন করিতে পারিল না, দেখার ভবিষ্যৎ ফলাফলও অনুমান করিতে পারিল না, ভয়ও পাইল না ; আরো পাঁচটি ছেলের সঙ্গে এবং তাহাদেরই মত উৎসাহের সহিত ছুটিয়া ছুটিয়া সে ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া গেল…

আগেই দেখিল জনতা—

গাড়ীতে-পা-কাটা একটি লোককে দেখিতে এত লোক কেন আসিয়াছে তাহা সঠিক্ অনুমান করা শক্ত, কিন্তু আসিয়াছে, এবং সেই হতভাগ্যকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া গেছে…যা' দেখিতে দাঁড়াইয়া তারা আছে তা' সুখেরও নয়, অদ্ভুতও নয়—অনুকম্পার টানে তারা আসে নাই, সাহায্য করিতেও আসে নাই, কিন্তু আসিয়াছে, এবং নানা কথার অবতারণা করিয়া হাসাহাসিও করিতেছে…

এই জনতা ভেদ করিয়া যাইয়া শশধর সেই বিচ্ছিন্ন-অবয়ব লোকটিকে দেখিল…ছিন্ন স্থানের দুমুখ দিয়া রেলের লাইনের এদিকে ওদিকে কত যে রক্ত পড়িয়াছে আর মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া বহিয়া গেছে তাহার অবধি নাই ; পাখানা হাঁটুর নীচে দু টুকরা হইয়া গেছে—টুক্‌রা পা-টা সমগ্র দেহ হইতে দূরে পড়িয়া আছে—বিচ্ছিন্ন স্থানটায় রক্ত টক্‌টক্ করিতেছে—খানিকটা মাংস ঝুলিয়া আছে…

আরো অনেক জিনিষ এবং ব্যাপার শশধর সেখানে দেখিল এবং অনেক কিছুই শুনিল—যথা আহত ব্যক্তির আর্তনাদ, তাহাকে

স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন, রেলকর্ম্মচারীদের ব্যস্ত আনাগোনা, এবং খাটিয়া ইত্যাদি—

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মনে তার ছাপ রহিয়া গেল আর কিছুই নয়—সেই রক্তের নয়, আর্ত্তনাদের নয়, ছিন্ন পা-খানার নয়, এই সবের হেতু একখানা চলন্ত শব্দায়মান গাড়ীর…

ফিরিবার পথে তার ভয় করিতে লাগিল গাড়ীর কথা ভাবিয়া। গাড়ী তখন সেখানে নাই, কিন্তু তার একটি কাজ চোখে দেখা গেল ‥ ।…শশধরের মন কল্পনা করিয়াই আতুর হইয়া উঠিল।… ভয়ঙ্কর অতএব তার কাছ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে বলিয়া যত জিনিষের ছাপ দুরপনেয় হইয়া তাহার মনে ছিল, চলন্ত গাড়ীর ছাপ হইল তাহাদেরই একটি।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল, সে দু'টি লাইনের ঠিক্ মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে—গাড়ী তুমুল শব্দ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তার পা উঠিতেছে না—পলায়ন করিতে সে পারিতেছে না…

ঘুম ভাঙিয়া গেল—

বুকের ধরফরানি তখন তার কত। বুকের উপর হাত র'খিয়া শশধর তার হৃদ্‌পিণ্ডের প্রাণান্তকর উত্তেজনা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইল।

তারপর হইতে কাহারো সঙ্গেই গাড়ীতে কোথাও যাইবার দরকার হইলে শশধর ষ্টেশনে যাইয়া অত্যন্ত একান্তে সরিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে; গাড়ীর গুরুগুরু গর্জ্জন যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তত সে পা গুটাইয়া, যেন লৌহ-পথের আকর্ষণ কাটাইবার চেষ্টায়, পিছু হটিতে থাকে—একেবারে বেড়ায় পা ঠেকিয়া অচল না হওয়া পর্য্যন্ত...

তারপর গাড়ীর চাকার শব্দ একেবারে নিঃশেষ হইয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে ওঠে, আর মনে মনে হাসে।

কিন্তু উহাই শেষ নহে—এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িলে একদা একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি অতটা চরমে উঠিতে পারিত না।

চিরকাল মনে থাকার মত নিদারুণ বিভীষিকাময় ঘটনা শশধর আরো দেখিয়াছে।

ভূত যদি থাকেই তবে তাহাকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিলে ভয় পাইবারই কথা—কারণ, সে পরিচিত পৃথিবীর কেউ নয়; পরচিত্ত "যতটা অন্ধকার তার চাইতেও অন্ধকার, অন্ধকারচারী ভূতের মন, অর্থাৎ ভূতের মনে কি থাকে, তারা কি ভাবিয়া আর কি উদ্দেশ্যে কি করে, তাহা অনুমান করিবার উপায়ই নাই—মানুষের বুদ্ধি অতটা দূরে পৌঁছায় না; তার উপর, ভূতের অনিষ্ট করিবার কতটা শক্তি এবং ইচ্ছা তাহা জানা নাই; অদৃশ্য থাকিয়াই প্রেতাত্মা যখন চিমটি কাটে এবং গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হয় তখন পলায়ন না করিয়া শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহাকে কাবু করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কেহ বলে

নাই…প্রধান সাক্ষী ঠাকুমা তা' চিরকালই অস্বীকার করিয়া গেছেন…সুতরাং ভয় পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তা-ই বলিয়া যেখানে অন্ধকার সেখানেই ভূত আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এমন আশঙ্কা করা অযৌক্তিক, এবং নিজেদেরই অন্ধকার ঘরের দিকে সেই কারণে তাকাইতে না পারা ভারি যন্ত্রণার আর দুশ্চিকিৎস্য হতাশার ব্যাপার।…কিন্তু ঠাকুমার জয় হউক—তিনি বালক শশধরের মন উত্তমরূপে ঠাসিয়া ঠাসিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেছেন—সেখানে যে-ভয় প্রবেশ করিতেছে সেই ভয়ই আর দূর হইতেছে না, রসস্থ স্থান পাইয়া চিরজীবী শিকড় চালাইয়া দিতেছে।

পাঁচ

সেদিন রবিবার, ছুটির দিন। কিন্তু মায়ের শাসনে শশধর রবিবারেও কিছুক্ষণের জন্য বই লইয়া বসিয়াছিল···তারপর সে বাহির হইল বাজার-বেড়াইতে—উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, খানিকটা চারিদিকে তাকাইয়া আসা, আর কোনো সঙ্গী স্যাঙাতের সাক্ষাৎ পাইলে একটু গল্প গুজব সলা পরামর্শ করা—

কিন্তু ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইবার কিম্বা কোনো সঙ্গী স্যাঙাতের সাক্ষাৎ পাইবার পূর্ব্বেই সে যাইয়া পড়িল এক হাঙ্গামার সম্মুখে।

দু'টি লোক ঝগড়া বাধাইয়াছে। পা-কাটা মানুষ দেখিবার লোকের অভাব হয় নাই, ঝগড়া দেখিবার লোকের অভাব হওয়াই অনুচিত; কারণ পথের পথিকের মন আর বাজারের লোকেরও মন একঘেয়েমিতে পীড়িত হইয়া একটু আমোদের আর চির-পরিচিত সংস্থানের ব্যতিক্রম দেখিবার জন্য লোলুপ হইয়াই থাকে।···এই ঝগড়া দর্শকগণের পক্ষে আরো সুখকর এই জন্য যে, ঝগড়া হইতেছে বাংলায় নয়, হিন্দিতে—আর, হিন্দুস্থানীদের ঝগড়ার ভঙ্গীই অন্য রকম। ভাষা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারায়

মনে হয়, ঝগড়া ওরা করিতেছে না, গল্পের বিষয়ের গুরুত্বে উত্তেজিত হইয়া বুঝি গল্পই করিতেছে—আর ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, ওরা যেন পরস্পরকে হাসাইতে চায়।

নানারূপ চীৎকার এবং কুৎসিত গালাগালাজের পর ক্রমশঃ পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া একজন আর একজনের উপর চাপিয়া পড়িয়া উহারা সুরু করিল মুখের কথার সঙ্গে ঘোরতর হাতাহাতি···এখনকার বিকট মুখভঙ্গী আর কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া কৃতসঙ্কল্প হস্তচালনা দেখিয়া দর্শকের হাসি একটু ক্ষীণ হইল—খুনের ইচ্ছা যেন উভয়ের মনেই জাগিয়াছে।

শশধর একটু ফাঁকায় যাইয়া দাঁড়াইল—:

অবগত হইল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট আঠার আনা পয়সা পাইবে—

এবং দেখিল, ঝটাপটি করিতে করিতে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের একজন আর একজনকে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া দৌড়াইয়া গেল; মনে হইল সে পলায়ন করিল বুঝি! কিন্তু পলায়ন সে করে নাই, কাপুরুষ সে নয়; তখনই সে তেমনি দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিল, শূন্য হস্তে নয়, সুদীর্ঘ এক বাঁশের লাঠি লইয়া এবং তাহারই সাহায্যে ঝগড়া শেষ করিয়া দিল তৎক্ষণাৎ—কেহ সাহস পূর্ব্বক বাধা দিবার পূর্ব্বেই প্রতিপক্ষের মাথায় সে বসাইয়া দিল সেই পাকা লাঠির এক ঘা—

মাথা ফাটিয়া ফিণ্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল, রাস্তার ধূলার উপরেই আহত ব্যক্তি লুটাইয়া পড়িল···

এত কলরব এক মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল—রক্তপাত দেখিয়া জনতা হাল্কা হইতে লাগিল…

শশধর দেখিল, রক্তে ধূলা ভিজিয়া কালো হইয়া যাইতেছে… দরদী লোকে যখন তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিল তখন, দেখিতে দেখিতেই, বেগবান্ রক্তে তাহার শরীর আর পরিহিত বস্ত্র ভাসিয়া গেছে—মুখ চোখ বহিয়া রক্তধারা পড়িয়া আর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া আর রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া লোকটার যে-চেহারা হইয়াছে তাহা বীভৎস এবং রোমাঞ্চকর। অনেকের মতই শশধরও কাঁপিতে কাঁপিতে সে-স্থান ত্যাগ করিল…তাহার চোখে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু মনে তাহা ঘটিল না—চিরজীবনের স্থায়িত্ব লইয়া তাহার মনে বিদ্ধ হইয়া রহিল উদ্দাম কলহ নয়, রক্তের সেই প্লাবন নয়, রক্তাক্ত কলেবর সেই মানুষটি নয়, রক্তপাতের হেতুটা, বাঁশের লম্বা লাঠিটা—ভারি মজবুত তার চেহারা, আর শূন্যে উঠিয়া চক্ষের পলকে সে মাথায় পড়িয়াছে!

কাহারো হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি দেখিলে শশধরের প্রাণে তীব্র আতঙ্ক জাগে।

ছয়

শশধরের বয়স এখন ষোল। সে পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে ঢের, এবং তার ভয় বিস্তর।

ঐ সব ঘটনা বহু আগেকার; কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য্য, ভাবিতেও আশ্চর্য্য; এখনো, এই ষোল বছর বয়সেও, তার জাগ্রত চৈতন্যেই ভয়গুলি আছে—দুঃসহ কঠিন অনিবার্য্য হইয়া তারা আছে।··· এখনো সে স্বপ্নে দেখে লাঠি—কাহারো হাতে নাই, তবু রক্ত-পিপাসু হইয়া আস্ফালন করিতেছে···

আর দেখে, চলন্ত গাড়ী—পর্ব্বতের মত বৃহদাকার, আর অসহনীয় তার বেগ—কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিতে চায়···

এবং আরো দেখে ভূতের খেলা—ভূত অন্ধকারে নানারূপ উপদ্রব করিতেছে—স্বপ্নে তাহারা তাহাকে আক্রমণও করে—পলাইতে যাইয়া সে অসাড় পা টানিয়া তুলিতে পারে না, ভয়ে মর মর হইয়া ওঠে···

তবে একটু রেহাই এই যে, ভয়ের এই নিদারুণ অস্তিত্ব আর উৎপাত কেবল তার নিজেরই মনের আধারস্থ বিষয়, আর অনুভূতি আর বিকার; ভয়ের উদ্বেগ এবং আলোড়ন ভারি কষ্টকর হইলেও

এমন কি ঘামাইয়া অবশ করিয়া তুলিলেও, খুব গোপনে আছে—আর কেউ তা টের পায় নাই—ক্লাস পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ ফেল করার মত তা' প্রকাশ্যভাবে গর্হিত হইয়া ওঠে নাই।

উপরন্তু, পরম সুখের বিষয় ইহা নিশ্চয়ই যে, শশধরের এত ভয়, স্বপ্নে এবং জাগরণে মর্ম্মগত তার এত ভয়, তার মনটাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিলেও, তার শরীরের কোনো অনিষ্ট করে নাই; তার দেহের বেশ শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে—বিনা চেষ্টাতেই হইয়াছে। শশধরের বাবা শ্রীধর শক্তিমান্ পুরুষ আকারে মস্ত—তিনি নিজের দেহের প্রতিরূপ পুত্রে দেখেন, এবং দেখিয়া খুসী হন্; অপরাপর লোকেও দেখে, এবং দেখিয়া খুসী হয় যে, কমনীয় কিশোর শশধরের শরীর গঠন অতিশয় সুশ্রী—শক্তির ব্যঞ্জনা তার দেহে আছে; দেহ চমৎকার ঋজু, জড়তা বিন্দুমাত্র নাই—বক্ষের প্রসার আর পেশীর তরঙ্গলীলা উপভোগ্য বটে।

তবু সেটা মোটামুটি ব্যাপার—অসাধারণত্ব আরোপ করিবার মত তা' নয়। কিন্তু চর্চ্চার দ্বারা শারীরিক দৃঢ়তায় এবং শক্তিতে অসাধারণ হইয়া উঠিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা একদিন তার জন্মিল ষোল বছর বয়সেই।···সেটাও একটা তামাসার ব্যাপার।

সাত

শশধরের বাবা শ্রীধর পি, ডব্লু, ডির-র সুপারভাইজার। তিনি বেতন কত পান, কন্যাদায়ে বিব্রত কি না, স্ত্রীকে স্বর্ণালঙ্কার কত টাকার দিয়াছেন, দেশের দিকে কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় জানাইবার দরকার নাই। বিহার উড়িষ্যায় তাঁর চাকরী, এবং তিনি বদলী হইয়া সম্বলপুরে আসিয়াছেন, সপরিবারেই আসিয়াছেন। শশধরও আসিয়াছে। শুষ্কবক্ষ মহানদীর তীরে ক্ষুদ্র এবং পরিচ্ছন্ন এই সহরটিকে এক-নজর দেখিয়াই শশধর পছন্দ করিয়া ফেলিল ..স্ত্রীলোকগুলির কাপড় পরার ধরণ আর গায়ে হলুদ মাখার ঘটা দেখিয়া অবাক্ হইল, এবং অধিবাসীদের কথা শুনিয়া একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

নূতন স্থানে শশধর বেড়ায় খুব।

নূতন বাড়ী তৈরী এবং পুরাতন বাড়ী মেরামৎ এবং নূতন রাস্তা তৈরী এবং ভাঙ্গা রাস্তা মেরামৎ করানোই শ্রীধরের প্রধান কাজ—ঠিকাদারের কাজ সুপারভাইজ করেন। সাক্ষাৎ তাঁহারই

তত্ত্বাবধানে এই একটা বাড়ীর অসম্পূর্ণ নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া এখন শেষ হইয়াছে—পাহাড়ের উপর অনেক উঁচুতে সেই বাড়ীটায় এক সাহেব অফিস করিবেন।

শেষ হইয়াছে, এখন বাড়ীর আঙ্গিনা আর আশপাশ আবর্জ্জনা-মুক্ত করিয়া দিলেই এবং ইট পাথর প্রভৃতি সরাইয়া দিলেই স্থানটী পরিপাটী এবং সাহেবের ব্যবহার্য্য হয়।···শ্রীধর সেই উদ্দেশ্যে কুলি মজুর লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—শশধর তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। ইট পাটকেল বাঁশ তক্তা ঝুড়ি ঝাঁকা টিন ভাঁড় প্রভৃতি ছোটখাট হাল্কা বস্তুগুলি অক্লেশেই এবং দ্রুতগতি দূরীকৃত হইল—বাকি রহিল পাথর একখানা—প্রকাণ্ড একখানা নিরেট্ পাথর। এই পাথরটা সরাইয়া সাহেবের চোখে না পড়ে এমন দূরে একটা স্থানে লইতে বিশেষ বন্দোবস্তের এবং কৌশলের প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীধর অনুমান করিলেন। ব্যাপারটা শ্রমসাধ্যও বটে, সময়ও লইবে অনেক।

শ্রীধর পাথরটার উপর পা তুলিয়া দিয়া তাঁর মেটের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এটাকে কি করে' সরাই বল্ ত?

বাবু পরামর্শ চাহিতেই বাবু তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করিয়াছেন ভাবিয়া পুলকিত মেট্ তৎক্ষণাৎ পাথরটার চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিল—যেন কোন্‌দিক হইতে ফুৎকার দিলে ইহাকে অনায়াসে স্থানচ্যুত করা যাইতে পারে, ছিদ্র দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাই নির্ণয় করা দরকার···

দেখিয়া আসিয়া মেট বলিল, বাগানো কঠিন কিছু নয়, বাবু;

জন তিনেক কুলিতে ধরাধরি করে' নিয়ে তফাতে ফেল্‌তে পারবে।

—পারবে ?

—তা পাররে, বাবু। ভাত খায় না ওরা ?

ভাত খাইলেই পাথর নড়ান' যায় শ্রীধর ইহা বিশ্বাস করিলেন কি না কে জানে ; জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু পাথর তুলে ধরে নীচেয় হাত ঢোকাবে কেমন করে ?

মেটু বলিল, বাঁশ লাগিয়ে চাড় দিতে হবে।

শুনিয়া শ্রীধর কিছু শান্তি বোধ করিলেন—কাজটা তত কঠিন তবে নয় ! স্ফূর্ত্তি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, একলা এই পাথরটাকে মাটি ছাড়িয়ে তুল্‌তে কি পাশ ফিরিয়ে দিতে পারিস্ কেউ ?

শুনিয়া শশধর চোখ বড় করিয়া বাপের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল...

কিন্তু শ্রীধর জানেন, কেহ তাহা পারিবে না ; তবু অকারণেই ঐ প্রশ্ন করিয়া তিনি হঠাৎ উদ্‌গ্রীব শ্রমিকমণ্ডলীর মুখের দিকে সকৌতুক হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন...সুন্দর বৈকালটিতে ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া একটু আনন্দ করা যাক্—

একটা তামাসার উদ্ভব হইতেছে মনে করিয়া বাবুর দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিল...

এবং "দেখি ত !" বলিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল শ্রীধরেরই জনৈক শ্রমিক, মহীন্দ্র !...বলা বাহুল্য যে, দৈহিক শক্তির জন্য মহীন্দ্র বিদেশেও না হোক্, এ অঞ্চলে বিখ্যাত, কিন্তু খ্যাতি তার যতই ব্যাপক হোক্ তা

সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত, এবং তার পক্ষপাতী আপনার জনের দ্বারা তাহা প্রচারিত—

এতটা শক্তি সে ধারণ করে তাহা তার বন্ধুরা আর পক্ষপাতী গোঁড়ারাও মনে করে না। এই পাথর মহীন্দ্র তুলিবে! আচ্ছা, দেখা যাক্।

লোকে দেখিতে লাগিল—

বাব্‌রি চুলে প্রচণ্ড একটা ঝাড়া দিয়া মহীন্দ্র নিঃশব্দে সেই পাথরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া নতচক্ষে পাথরটাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সে যেন পাথরটার ওজন আন্দাজ করিতে লাগিল···

সকলের সঙ্গে শশধর তার বক্ষ আর বাহুর দিকে তাকাইয়া রহিল···সহস্রবার দেখা সেই বক্ষের প্রশস্ততা আর বাহুর দৈর্ঘ্যের দিকে তাকাইয়া, এই দুরূহ পরীক্ষার সময়ে তার কর্ম্মসঙ্গীরা হঠাৎ যেন অবাক হইয়া গেল—মনে হইল, পারিবে।

শ্রীধর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুলতে পারবিনে?

মহীন্দ্র বলিল, তুল্‌তে?

কিন্তু বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাহার এই অন্যমনস্ক প্রশ্ন বাবু বা কাহারো উদ্দেশ্যে নয়—কেবল দুঃখদায়ক একটা সংশয়ের অভিব্যক্তি সেটা।

শ্রীধর বলিলেন, যাই করো, বাপু, সাবধান—যেন জখম হ'ও না।

শশধর দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—

এই কুলিটার দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যে অভিমানী আভিজাত্যের

পারিপাট্যসহ একটা অপরূপ শক্তিশালী দর্প যেন আছে। চমৎকৃত হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে শশধরের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল—যেন লোকটার পৌরুষ আর শক্তির দীপ্তি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তাহার শরীরে সত্তায় প্রবেশ করিতেছে···

জখম হইবার বিরুদ্ধে শ্রীধরের সতর্ক বাণী মহীন্দ্র বিশেষ কানে তুলিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। মনঃসংযোগ করিয়া আর দু'হাঁটু পাতিয়া সে পাথরের সম্মুখে বসিল···

শশধরের মনে পড়িল, পাঠ্য পুস্তকে একটা বাঘের ছবি সে দেখিয়াছিল—ছবির বাঘটা মৃত স্বীকার সম্মুখে করিয়া ঠিক্ যেন ঐরকম করিয়া বসিয়া আছে।

শশধর তার হাত দু'খানা বুকের উপর শৃঙ্খলিত করিল—

অন্যান্য দর্শকের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—

শ্রীধর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মহীন্দ্র কোমর শক্ত করিয়া আর নুয়াইয়া পাথরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল··· তার ঘোর কালো আর রোমাবৃত সুবৃহৎ হাত দু'খানা দ্রুত-বেগে প্রসারিত হইয়া পাথরের দুইপ্রান্ত যেখানে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে সেখানে পৌঁছিল—নখ দিয়া কুড়িয়া খানিক্ মাটি সরাইয়া পাথরের নীচেয় সে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইল—তারপর তার বুক আর পিঠ মাত্র দু'টি মুহূর্ত্ত থরথর করিয়াই দৃঢ় হইয়া রহিল···তার পৃষ্ঠের আর পঞ্জরের মাংসপেশীগুলি সহসা স্ফীত আর কঠিন হইয়া উঠিল···

তারপর সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া পাথরটাকে ঊর্দ্ধ-দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল…

দর্শকরা দেখিল মহেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়াছে, চোখের তারা সিন্দুর হইয়া আছে…তারপর সে যেন কোটিপ্রদেশেই দেহের সমস্ত শক্তি পুঞ্জিভূত করিয়াই অত্যন্ত ধীরে ধীরে সমগ্র শরীরটাকে উপরের দিকে তুলিতে লাগিল…সঙ্গে সঙ্গে পাথর শূন্যে উঠিল, আগে একপ্রান্ত কাৎ হইয়া তারপর উভয় প্রান্তই পর্য্যায়ক্রমে, তারপর মাত্র একটী নিমিষের জন্য সমগ্র পাথরটা সিকি ইঞ্চি পরিমাণ শূন্যে করিয়া দোল খাইল…ঐ পর্য্যন্তই—

তারপরই সে হাত টানিয়া লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—পাথর আবার মাটিতে স্থিতিলাভ করিল ; তখন মহীন্দ্রের নিশ্বাস পড়িতেছে অতিশয় দ্রুত—কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে…

ঘাম মুছিয়া মহীন্দ্র 'দমের প্রবল টানের ভিতর কষ্টে উচ্চারণ করিল, বেজায় ভারি। পারলাম না।

কিন্তু সে যাহা পারিয়াছে তাহাই ঢের, আর আশাতীত এবং তার মুখের কথা, বিষন্ন হতাশার কথা, কারুরই কানে পৌঁছিল না ; যেটুকু সে পারিয়াছে সেইটুকু পারার ক্ষমতারই ক্ষিপ্ত জয়ধ্বনিতে তার মুখের শব্দ ভাসিয়া গেল—

শশধর আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

শ্রীধর বলিলেন, বহুত আচ্ছা।

কিন্তু আরো, এমন কি তার চতুর্গুণ কি তারো বেশী

বিস্মিত হওয়ার আর উল্লাসের ঘটিল তারপরে। মাথায় প্রকাণ্ড মুরেঠা বাঁধা, গায়ে কুর্ত্তা আঁটা, আর বেজায় মোটা সূতার খাটো একখানা কাপড় পরা একটা লোক আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল—

মহীন্দ্রের প্রস্তরোত্তলন সে দেখিয়াছে, এবং সে কি তা কেউ জানে না। এই অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি আরো খানিক তুলতে পারি বোধ হয়। দেখব?

বলিয়াই, অর্থাৎ প্রার্থিত অনুমতি কেহ দিবার পূর্ব্বেই, সে মুরেঠা খুলিয়া ফেলিয়া কুর্ত্তার বাঁধন খুলিতে সুরু করিল…

তামাসা আরো চমকপ্রদ হইয়া উঠিতেছে—

শ্রীধরের শ্রমশিল্পীগণ উচ্চকণ্ঠে কলরব করিয়া উঠিল: হাঁ, হাঁ…

অর্থাৎ এই সঙ্গত সাধু প্রস্তাবে তাহারা আপত্তি করিবে কি, বিস্তর খুশীই হইয়াছে।

শ্রীধরও আপত্তির কারণ দেখিলেন না, কিন্তু বলিলেন, পারো ভালই, কিন্তু বখ্‌শিস আমি দিতে পারব না।

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীধর চিরকাল খর দৃষ্টি সম্পন্ন।

লোকটি পুনরায় কথা কহিল—অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে সে।—বলিল যে, বলবত্তার প্রতিযোগিতা ইহা নহে, একটি তুচ্ছ ক্রীড়ামাত্র; এবং পুরস্কার লইয়া লাভবান হইবার আশা সে করে না। বলিয়াই যেন ঈষৎ টলিতে টলিতে যাইয়া সে পাথরটার কাছে দাঁড়াইল……

তার খানিক পরেই দর্শকবৃন্দের মনে হইল, পাথরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করিয়া, আর

হাত দু'খানা অত্যন্ত নিস্তেজভাবে ঝুলাইয়া দিয়া লোকটা যেন ধ্যানস্থ হইয়া গেছে—সে যেন দৈবদেয় একটা উজ্জীবনের প্রতীক্ষা করিতেছে……

চুল দাড়ি গোঁপ পরিষ্কাররূপে ক্ষেউরি করা; ইহারই দরুণ বোধ হয় শ্রীধরের হিন্দু ভাবাপন্ন শ্রমিকগণের মনে হইল, এ ব্যক্তি ঈশ্বর ভক্ত এবং তাঁর অনুগৃহীত; তদুপরি, সহসা এমন ধ্যানমগ্ন হইয়া যাওয়া যার-তার কাজ নয়।… …চেহারা আছে ভাল—মহীন্দ্রের চাইতে অধিকতর সুসমঞ্জস্ এবং শক্তির ব্যঞ্জক; মহীন্দ্রের গায়ে মাংস বেশী, তাকে ঢলঢলে দেখায়, এ-ব্যক্তির হাড় মোটা—হঠাৎ মনে হয়, হাতুড়ি পিষিয়া ইহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে—ভিতরে বায়ু নাই, একেবারে নিরেট। মহীন্দ্রের কটি স্থূল, ইহার সরু, পশুরাজের মত……কিন্তু এই সব আকার-গত বিশিষ্টতা তারিফ করিবার সময় বেশী পাওয়া গেল না…

অদ্ভুত অভাবনীয় ব্যাপার তারিফ করা শেষ করিবার পূর্ব্বেই ঘটিয়া গেল; এরা আগে কখনো তা' দেখে নাই, দেখিবার পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই—

দেখা গেল, তার সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ যেন বিস্তৃত বৃহত্তর হইতেছে …কুম্ভকযোগে হনুমান তাঁর দেহ আকাশব্যাপী করিতেন শুনা গেছে—এ যেন প্রায় তা—ই।…তারপর যেন কেবল তারই অভ্যস্ত যোগবলেই তার পদতলের মৃত্তিকাগর্ভ হইতে একটা তেজের প্রবাহ উত্থিত হইয়া তার পদতল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল……

তাহাই ঘটিয়াছে, নতুবা ভিতর হইতে যেন একটা আলোক নির্গত হইয়া তার সকল শরীর এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কেন!

হঠাৎ তার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল—সে প্রস্তুত—

একবার অগ্রসর হইয়াই সে নত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ, চোখের পলক না পড়িতেই সকলেই দেখিল, পাথরটাকে সে মাটির উপর হইতে শূন্যে টানিয়া তুলিয়া হাঁটুর কাছে ধরিয়া আছে এমন অক্লেশে আর সহজ ভঙ্গীতে যেন পাথরেরই ভিতর ফাঁপা বুদ্বুদ সেটা।

কি করিয়া কি ঘটিল কিছুই মাথায় ঢুকিল না; সবটাই, শক্তির সঙ্গে এই ক্ষিপ্রতা, যেন ভেল্‌কী—লোকের তাক্ লাগিয়া গেল। সকলে নিঃশব্দ হইয়া রহিল—

কেবল মুরুব্বি হিসেবে শ্রীধর বলিলেন, বাঃ! কিন্তু আরো আছে…

লোকে ভাবিতেছিল, এইবার সে পাথরটাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাতেই মহীন্দ্রের উপর জয়ী হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা সে করিল না, ছাড়িল না—অক্লেশেই সে পাথরটাকে আরো একটু উঁচুতে তুলিল……

শশধরের মনে হইল, পেশী-সঞ্চালন দেখিতে আশ্চর্য্য, চমৎকার বটে, কিন্তু যেন অশরীরী একটা ভৌতিক ব্যাপারের মত তা' বুদ্ধির অগম্য—কি তাদের ঠেলিয়া তুলিতেছে, টানিয়া নামাইতেছে আবর্ত্তিত করিতেছে, আর অশ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে তাহার কিছুই ঠিক্ নাই……

বাঁ পা পিছাইয়া লোকটি ডান পায়ের জানুগ্রন্থি একটু মুরিয়া লইল—বাঁ হাঁটু মাটিতে চাপিয়া বসাইল…ততক্ষণে সেই প্রস্তর তুলিয়া তুলিয়া আরো উঠিতেছে—

তারপর হঠাৎ থামিয়া লোকটা কাঁপিতে লাগিল, যেন ভাঙিয়া পড়িবে; কিন্তু তা' নয়—পরক্ষণেই দেখা গেল, কনুই পর্য্যন্ত পাথরের নীচেয় লইয়া পাথর খানাকে সে প্রসারিত হাতের উপর ধারণ করিয়া আছে…

বিস্ময়ে শ্রীধর প্রভৃতির ভূত-ভবিষ্যৎ ভুল হইয়া গেল। কিন্তু ইহাও শেষ নহে—ইহার পরও আরো আছে…

মানুষের চোখ ঠিকরাইয়া-উঠিয়া দেখিতে লাগিল :

সমান্তরালে অবস্থিত নিরালম্ব দুইখানি বাহুর উপর পাথর টাল খাইতেছিল—টাল খাওয়া সে থামাইল; পাথরটাকে হাতের উপর সুস্থিত করিয়া লইয়া তারপর সে অটল দেহে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল…

তামাসা স্বপ্নাতীত অসম্ভব চরমে উঠিল এখন—

বিস্ময় আর অহেতুক এবং অব্যক্ত একটা উৎকণ্ঠা যেন বেদনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া অপার সেই অনুভূতি শ্রীধর প্রভৃতির মনের সীমায় আর স্থান পাইতেছে না…

এতক্ষণ শরীরের সমুদয় শক্তি সে বোধহয় নিঃশেষে প্রয়োগ করে নাই, এইবার করিবে…তার দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া বসিল, চোয়ালের হাড় কঠোর হইয়া উঠিল; পেটের, হাতের, কাঁধের, পাঁজরের পেশীগুলি যে কী উন্মত্ত খেলা খেলিতে লাগিল

তাহার না রহিল ইয়ত্তা, না রহিল নিশ্চয়তা—যেন নিঃশঙ্কায় শাসন ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া তারা কাহাকেও ধ্বংস করিতে চায়!

পাথর বুক পর্য্যন্ত উঠিল—

তারপর চিবুক পর্য্যন্ত—

এবং তারপরই সে পাথরখানা ছুড়িয়া দিল…পাথর কোথায় পড়িল, পড়িল কি শূন্যেই রহিল, তাহা তাকাইয়া থাকিয়াও কেহ অনুভব করিতেই পারিল না…শ্বাসপ্রবাহ আপনি রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী তখন যেন স্পন্দনহীন হইয়া গেছে—কিছুই তার চোখে পড়িতেছে না—কোনোদিকেই তার জ্ঞান নাই।

তারপর সহসা একটা শব্দ উঠিল—স্তব্ধ আব্‌হাওয়া আর নিশ্চল বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া আচম্বিতে যেমন বাজের মেঘ ডাকিয়া ওঠে…

শ্রীধর হঠাৎ সচেতন হইয়া সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করিলেন: বলিহারি!

এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিল—হা হা হা…

মহীন্দ্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: জয় গিরি-গোবর্দ্ধনধারী।…বলিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া অপরিচিত বীরের পায়ের কাছে সে কেবল প্রণত নয় ভূলুণ্ঠিত হইল।

শশধরও চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, তারপর সে অনুভব করিতে লাগিল, কেমন একটা পুলকে তার দেহ সির্‌সির্ করিতেছে।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে—লোকে সেই ব্যক্তির পা পূজা করিয়া তবে ছাড়িল।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীধর চিরকাল খরদৃষ্টি সম্পন্ন হইলেও হঠাৎ তাঁর সেই দৃষ্টি নিস্তেজ হইয়া গেল—পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া তিনি তাহাকে বখশিস্ দিতে গেলেন...সে লইতে অস্বীকার করিল, তবু তিনি টাকাটা তার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

শক্তিপূজার এই দৃশ্য, আর এই হর্ষ—অকপট এবং অশেষ—অন্যত্র মাত্র একটা গল্পের বিষয়রূপে সজীব হইয়া থাকিলেও শশধর তাহা গ্রহণ করিল অন্য ভাবে, মন্ত্রের মত—তার গুরুকরণ ঘটিল।... এমন শক্তিসঞ্চয় যে ব্যক্তি করিয়াছে তার অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—সে যদি মূর্খও হয় তবু সে ধন্য...

শক্তির সাধনায় সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় আর উচ্চাভিলাষে পূর্ণ হইয়া শশধর সে দিন বাড়ী ফিরিল।

ষোল বছর বয়সে তার শারীর চর্চ্চার সুরু।

আট

ঐ সব ঘটনা এবং শশধরের ব্যয়ামাভ্যাস দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, সুতরাং উহা এখন পুরাতন প্রসঙ্গ। অপরাপর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া একটা সুখদ চিন্তার আকর হইয়া সে আছে—অপরূপ একটা মায়াও সেই অতীতের প্রতি আছে, কিন্তু সে উত্তেজক কিছু নয়।

আবার ইহাও পুরাতন প্রসঙ্গ যে, শ্রীধর পরলোক গমন করিয়াছেন। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে চিরকাল খরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও শ্রীধর এমন কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাকে একটা কিছুর ভিত্তিরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে। শশধর দুস্তর এবং দুর্ব্বোধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে থাকিয়া এবং তাহারই ইঙ্গিতে বিদ্যার্জ্জনের কু-অভিনয়টা ত্যাগ করিয়াছে...তারপর সে বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে...তাদের একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী মারা গিয়াছেন পৌত্রের জন্মের পূর্ব্বেই।

বর্ত্তমানে—ছাব্বিশ বৎসর বয়সে—শশধর চাকুরিয়া।

লেখাপড়ার সঙ্গে আজকাল অর্থ উপার্জ্জনের সম্পর্কটা প্রায়

ঘুচিয়া গেছে—লোকে বলে। যে নাকি যেমন সুযোগ পায় তার তেম্‌নি শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি ঘটে। কিন্তু শশধরের বেলায় তা' যে ঘটে নাই তা' দেখাই যাইতেছে; সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সুবর্ণ সুযোগে দৈবাৎ এবং অদৃষ্টলক্ষ্মীর অপ্রত্যাশিত আর দুর্লভ প্রসন্নতায় মাতব্বরী পদ সে পায় নাই; তার সামান্য চাকুরী, সামান্য বেতন।

সকল বিষয়েই তার এই সামান্যতা, অর্থাৎ এই হতাশকর ব্যাপারসমূহ, দীর্ঘ দশ বৎসর সময়টা যেন কৌতুকের খেয়ালে আচম্‌কা মোড় ফিরিয়া ফিরিয়া আর পুনঃ পুনঃ মুচ্‌ড়াইয়া উঠিয়া সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। দুঃখ পাইয়া মনে মনে এই বিধানের প্রতিবাদ সে অবশ্যই করিয়াছে, কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে!···তবে পরম সুখের বিষয় ইহাই যে, অদৃষ্টের আচরণে নিজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সে পয়সা ছাড়া আর-সবকেই পরিত্যাগ করে নাই—সাধুবাদে উৎসাহ পাইয়া ব্যায়ামের অভ্যাসটি সে বজায়ই রাখিয়াছে। এই ছাব্বিশ বছর বয়সে শশধর শারীরিক যে শক্তির অর্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহার কেতাবী বিদ্যার মত অকিঞ্চিৎকর ত' নয়ই, সাধনা দ্বারা অর্জ্জিত এবং সংসারে সুলভ নহে বলিয়া তাহা বিশেষ অহঙ্কারের বস্তু—এবং প্রচুর বলিয়াই লোকে জানে, আর হা করিয়া দেখে।···পদক আছে কয়েকটি।

বলা বাহুল্য, শশধরের মেলাই শিষ্য জুটিয়াছে। তারা ব্যায়াম শিক্ষা করে।

কিন্তু শশধর প্রায়ই বলে। শুধু চচ্চড়ি খেয়ে আর মুগুর ভাঁজার কাজ নেই। হাড়ে ধাক্কা খেয়ে কবে মরে যাব।

শশধরের স্ত্রী প্রফুল্ল সে-কথা বিশ্বাস করে না—স্বামীর দুর্জ্জয় শরীরের দিকে পুলকিত চক্ষে চাহিয়া সে হাসে।

বছর দেড়েক আগেও শশধরের শারীরিক শক্তির একটি পরীক্ষা এখানে হইয়া গেছে।

পুনরায়, সে-ও এক তামাসা।

নয়

ক্ষুদ্র হোক্, বৃহৎ হোক, স্থানটা লোকালয় হইলেই সেখানে ষাঁড় থাকা প্রয়োজন—এখানেও আছে। স্থানীয় লোকে ষাঁড়ের নাম রাখিয়াছে শঙ্কর—কেবল সুরযমল মাড়োয়ারী তাকে ডাকে মৈনাক্ বলিয়া—দেখিলেই হাঁক ছাড়িয়া বলে, মৈনাক্ হো!··· সুবৃহৎ অটল জীব—অত্যন্ত বনিয়াদি অহংসর্ব্বস্বের মত শঙ্করের চাল-চলন; তার কণ্ঠ নির্ঘোষে মাটি কাঁপে। কাহাকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না; লঘুগুরু প্রত্যেকটি মানুষকে অত্যন্ত অবহেলার

চক্ষে দেখিয়া পথে ঘাটে, ক্ষেতে খামারে, এমন কি গৃহস্থের সামান্য শাকের ক্ষেতেও, সে বিচরণ করে—মহাদেবের প্রতিনিধি যেন!—আদরও পায়, ঠ্যাঙাও খায়; গর্জ্জন করে ভীষণ কিন্তু মারে না। ফলের এবং চা'ল-ডালের দোকানের সম্মুখেও তাহাকে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।

নির্লিপ্ত শান্ত জীবটি ঐ শঙ্কর, কিন্তু একদিন বড় দুর্দ্দৈব ঘটিল; দোষ শঙ্করের তত নয় যত এই গ্রীষ্ম প্রধান রৌদ্র-জ্বালার দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৌরাত্ম্যপ্রিয় মক্ষিকার, এবং একটি সাতিশয় অবিবেচক লোকের।

শঙ্কর, অথবা মৈনাক, অতীব মন্থর—পরিশ্রম বিশেষ সে করে না, কিন্তু বিশ্রাম করে খুব—কখনো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, কখনো শুইয়া শুইয়া। একদিন সে শুইয়া শুইয়া বড় উৎপাত বোধ করিল।…গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ বাতাস পথ হারাইয়া পৃথিবীর কোন প্রান্তে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে কে জানে, কিন্তু এদিকে তার একটুও সাড়া নাই; বড় গুমোট্ করিয়া আছে। পথে রোদ্ ছিল; শঙ্কর বোধ করি গুমোটে উত্তাপে অতিষ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে যাইয়া বিশ্রামে বসিল গুরুচরণ বাবুর বাইরের উঠানের ঠিক্ মধ্য-স্থলে, এমন অসঙ্কোচে যেন তার সেখানে প্রবেশে নিষেধ করিবার মালিক কেহ নাই। বদ্‌রাগী বলিয়া শঙ্করকে দোষী কেউ করে না—তার সে-অপবাদ নাই; কিন্তু আজ অপরাহ্ণে তার মেজাজ যেন ভাল নাই—গায়ে পিঠে লেজ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে ভারি ক্লান্ত আর ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—মক্ষিকার উপদ্রব আজ

অসহনীয় যেন…পঙ্গপালের মত অজস্র মক্ষিকা দলে দলে তার মুখে চোখে বসিতেছে, নাকে কানে ঢুকিয়া যাইতেছে, দংশনও না করিতেছে এমন নয়। লেজ সাপ্‌টাইয়া আর ফোঁস্‌ফোঁস্‌ শব্দ করিয়াও শঙ্কর কিছুমাত্র স্বস্তি পাইতেছে না—আজ সে বিপন্ন।… দুরন্ত মক্ষিকাকুল কোথায় এবং কখন তাহার নাগাল পাইয়াছে তার ঠিক্ নাই, কিন্তু আরও অধ্যবসায়ী ছোট ছোট জীবগুলি শঙ্করকে বহুক্ষণ হইতে এক মুহূর্ত্তও শান্তিভোগ করিতে দেয় নাই—গুরুচরণ বাবুর উঠান্ পর্য্যন্তও তাহারা আসিয়াছে, কেহ উড়িয়া উড়িয়া, কেহ তাহার দেহেই আরোহী হইয়া আরামপূর্ব্বক।… শঙ্করের নিঃশ্বাসপতন যতই অসহিষ্ণু আর সশব্দ জোরালো হোক্ তাহাতে আর কোনো ফল হয় নাই, খানিক্ ধূলাবালি উড়িয়াছে মাত্র। শঙ্করের কণ্ঠমন্ত্রও শুনিতেই ভয়ঙ্কর—মক্ষিকা বিতাড়নে তা' সমর্থ নয় একটুও। হতাশ হইয়াই শঙ্কর এই ছায়ায় আসিয়াছিল—

কিন্তু সেখানেও তার স্থান হইল না—তাহাকে উঠিতে হইল। ছোট ছোট ছেলেদের খেলার স্থান এই উঠান্, এবং খেলার সময়ও এ-ই। তাহারা খেলিতে আসিয়া দেখিল, তাহাদের খেলার জায়গা অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছে শঙ্কর। পরিচিত আর নিরীহ অহিংস বলিয়া শঙ্করকে তাদের তেমন ভয় নাই—হৈ রৈ করিয়া, কঞ্চি দিয়া তার গা খুঁটাইয়া, আর তাহার লেজ ধরিয়া টানিয়া ছেলেরা তাহাকে তুলিয়া দিল—তাহাকে উঠিতেই হইল।… ধীর গতিতে উঠান্ পার হইয়া, পগার পার হইবার সময় বিড়ালের

মত লঘু ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত একটি লম্ফ প্রদান করিয়া শঙ্কর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল···দুর্দ্দান্ত মক্ষিকাগুলি তখনো তাহাকে ত্যাগ করে নাই—অনিবার্য্য নিয়তির মত, কিন্তু নিঃশব্দে নহে, পাখার ঝঙ্কার বাজাইয়া, তাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে···

রাস্তায় আসিয়া শঙ্কর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সহিষ্ণুতার অবিকল মূর্ত্তির মত—যেন সে জানে; মহাদেবের বাহন সে, তাহাকে অধীর হইতে নাই।···মুহুর্মুহু তার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ বহিতেছে, ককুদ প্রকম্পিত হইতেছে, কিন্তু ক্রোধ তার মনের ত্রিসীমানায় নাই। তার প্রগাঢ় কৃষ্ণতার চক্ষু দুটির দৃষ্টি ভারি করুণ, যেন সে সহৃদয়তা আশা করিয়া মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে—ত্রাণ আর সেবা প্রার্থনা করিতেছে···

একটি পথিক হনহন্ করিয়া আসিতেছিল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল···বাবা ষাঁড়!—বলিয়া সে শঙ্করের গুরু নিতম্বে আদরের একটা চপটাঘাত করিয়া পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল।

লোকটার আদরের চপেটাঘাতকে প্রহার মনে করিয়া শঙ্কর অবশ্যই ভুল করিল না—বরং লোকটির দিকে চোখ ফিরাইবার সময় তাহার চোখে যে কাতরতা ফুটিল তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি ভয়ে পাকাঘর না করিয়া মক্ষিকাগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া গেলে শঙ্কর কৃতজ্ঞ হইত..মানুষের ভালবাসা আর অনুকম্পা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—দুঃখে কেহ নিস্তার

দিক্, এ-কামনা তার আছে এবং থাকিবারই কথা, কিন্তু তেমন দয়ালু কেহ আসিতেছে না কেন ?

যে-স্থানে মক্ষিকারা বেশী দুঃসহ সেইখানেই যেন বেশী মধু, আর সেখানে যাইয়া বসিতেই তাদের যেন বেশী আনন্দ।—চোখের কোণে, নাকের আর কানের গহ্বরে তাহারা দলে দলে প্রবেশ এবং বিচরণ করিতেছে; অসহনীয় হইলেও শঙ্কর বলিয়াই তাহা সহ্য করিয়া আছে, অন্য ষাঁড় হইলে এতক্ষণ কি করিয়া বসিত তার ঠিক নাই।

কিন্তু তার যন্ত্রণা হঠাৎ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল—তার লেজের নীচেকার অতিশয় কোমল স্থানটি একটি বিষাক্ত মক্ষিকা তীক্ষ্ণ দংশনে বিদ্ধ করিল……

শঙ্করের কণ্ঠ দিয়া আর্ত্তনাদের একটা গভীর নাদ নির্গত বুঝা —প্রবল ভাবে মাথা ঝাড়া দিয়া সে পা বাড়াইল…ধরণে বুঝা গেল, এইবার সে অসহিষ্ণু হইয়াছে…

কিন্তু রাগ তার তখনই পড়িয়া গেল—

ঐ একটা মানুষ আসিতেছে; শঙ্করের বোধ করি মনে হইল; লোকটার এদিকে আসার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই—তাহাকে উদ্ধার করিতেই সে আসিতেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যেন সেখান হইতেই গলা বাড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্রত্যাশিত উদ্ধার-কর্ত্তার দিকে একটু দ্রুতপদেই অগ্রসর হইতে লাগিল…

মানুষটি আর কেউই নয়, এখানকারই বাসিন্দা, ভদ্র এবং ব্যবসায়ী শ্রীদিনকর দে। দিনকরের বয়স এই আটচল্লিশ হইবে—

অত্যন্ত দুর্ব্বল আড়ষ্ট চেহারা। দিনকরের বাড়ীটা যে পাড়ায় দোকানটি সে-পাড়ায় নয়। দ্বিপ্রহর অন্তে আহারাদির পর দিবা-নিদ্রা দিয়াছিল—নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুড়ির সঙ্গে এক গেলাস চা খাইয়া সে দোকানে যাইবে বলিয়া দ্রুতগতি বাহির হইয়াছিল; কিন্তু পথের মাঝে তার অগ্রগতি বাধা পাইল।

শঙ্কর দরকারী আর পরিচিত এবং লোকের প্রিয় জীবটি হইলেও সে ষাঁড়, এবং মহাদেবের প্রশান্ত বাহন হইলেও বীর্য্যবান্ পশু; বিরাট নিটোল দেহ তার, আর বাঁকা দুটো সিং আছে—ভারি শক্ত; শৃঙ্গের আঘাতে সে পর্ব্বতকে বিদীর্ণ এবং দেহনিক্ষেপে পর্ব্বতকে নিধাপিত করিতে পারে, এধারণা সকলেরই না থাকিলেও, তাহারই দিকে শঙ্করকে আসিতে দেখিয়া নির্জ্জীব দিনকর দে'র তা মনে হইল, এবং সন্দেহ রহিল না।

দিনকর দে অম্‌নিই আড়ষ্ট—ভয়ে আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল। এম্‌নি দুর্গত অবস্থায় ত্রাণকর্ত্তার আগমনে মানুষের মুখে চোখে যে ভাব ফুটে, শঙ্করের মুখে চোখে তা' ছিল না। কাজেই দিনকরও পড়িল সঙ্কটে। শঙ্করকে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে সে দুই হাত শূন্যে তুলিয়া এলোমেলোভাবে আন্দোলিত করিতে লাগিল, এবং আপত্তিসূচক চীৎকারও সে করিতে লাগিল প্রচুর এবং প্রবলভাবে। শঙ্করের বন্ধুভাবটা তাহাতে বাধা পাইল। দিনকরের আত্মরক্ষায় এই তৎপরতা যে বন্ধুভাবের বিরোধী, আর সহৃদয়তার অভাব তা'তে আছে, অর্থাৎ আর্ত্ত জীবের পরিত্রাণার্থ দিনকর উৎসাহী নহে, তবে শঙ্কর, পশু হইলেও,

বুঝিল……যেন বিস্মিত হইয়া আর ক্ষোভের সঙ্গেই সে আগ্রহ দমন করিল। একেবারে দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল……

দিনকর ভাবিল, হুঙ্কারে আর হাত পা নাড়ায় ফল হইয়াছে, শঙ্কর ভয় পাইয়াছে।……তখনো শঙ্কর খুব কাছে আসে নাই…… তাহাকে আরো ভয় পাওয়াইতে, অর্থাৎ তার মুখ বিপরীত দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দিতে, অব্যর্থ একটা প্রহরণের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দিনকর সট্ করিয়া তুলিয়া লইল ভাঙা ইটের টুকরো একটা—শঙ্করের শরীরের দিকে সেটাকে সে ছুড়িয়াও দিল, কিন্তু, কত জোরে ঢিল ছুড়িলে কতদূরে যাইয়া পড়ে দিনকরের সে ওজন-জ্ঞান না থাকায় ইটের টুক্‌রো অতবড় শরীরটাকেও ডিঙ্গাইয়া পড়িল শরীরের বাহিরে—শঙ্করের গায়ে লাগিল না; কিন্তু উহাতে শঙ্করের বুদ্ধির কাছে একটা কথা পরিষ্কার হইয়া গেল: ও-পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—ও-পক্ষ যুদ্ধই চায়। তথাপি শঙ্কর বোধ হয় মানুষ দিনকরের মত তুচ্ছ শত্রুকে অবজ্ঞাভরে পরিহারই করিত—একবার নাক ডাকাইয়া সে দাঁড়াইল; তারপর ফিরিবার উদ্দেশ্যেই সে মুখ ঘুরাইতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য দিনকর দে'র তখন দুর্মতিই প্রবলতম—আততায়ী তাহারই ভয়ে পলায়মান হইয়াছে মনে করিয়া তার তেজ বাড়িল; মনে হইল, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। অতএব সে স্ফূর্তির সঙ্গে আর একটা ইটের টুক্‌রা নিক্ষেপ করিল……এটা বৃহত্তর বস্তু—নিক্ষিপ্ত হইল বেশ জোরেই, এবং অদৃষ্টের আরো নিগূঢ় ক্রীড়া

নৈপুণ্য এইখানেই যে, এবারকারটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না—শঙ্করের শরীরেই সেই লোষ্ট্র পড়িল, এবং তাহাকে আঘাত করিল ভারি বেদনাচেতন সঙ্গীন একটা স্থানে, নাকে।·· ···শঙ্কর ঝাঁকি দিয়া মাথা তুলিল—দু'বার গাঁক্ গাঁক্ শব্দ করিল; এবং তাহাতেই দিনকর দে'র ঘটে তোলা-ছটাকের বুদ্ধি বাদে আর-যেটুকু বুদ্ধি এবং প্রাণে যেটুকু সাহস আজন্ম ছিল, এবং এখন মিলাইয়া যাইয়া আবার দেখা দিয়াছিল তাহা, চক্ষের নিমেষে রসাতলে তলাইয়া গেল······

কাপুরুষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

ইহার পর যে ট্র্যাজিডি ঘটিল তাহা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। ঐ পলায়নপর নড়বড়ে কৃশ লোকটাকেই এতক্ষণের সমস্ত যন্ত্রণার মূল মনে করিয়া সহসা জাগ্রত পাশবহিংসায় শঙ্করের মাথা আগুন হইয়া উঠিল······প্রতিহিংসা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্ত হইয়া সে দিনকর দে'র পশ্চাদ্ধাবন করিল······

ভাবিতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়, যে, দিনকর দে'র সেদিন দিনারম্ভ হইয়াছিল যারপরনাই অযাত্রায়। পলায়ন করিয়া সে একটা নিরাপদ স্থানে, শঙ্করের অগম্য স্থানে, পৌঁছিতে নিশ্চয়ই পারিত—কিন্তু তার পূর্ব্বোক্ত দুর্ম্মতির চাইতে তার দুষ্টগ্রহ এখন আরো প্রবল, আর নাছোড়বান্দা······ছুটিতে ছুটিতে সম্মুখেই সঙ্কীর্ণ রাস্তার মোড়ে খানতিনেক গরুর গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া পাশ কাটাইবার ফাঁক খুঁজিতে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল······ বেচারার হতবুদ্ধিতা চরমে উঠিয়াছিল নিশ্চয়ই; নতুবা মুহূর্ত্তও

যে মূল্যবান্ তাহা সে সহসা এ হেন সঙ্কটকালে বিস্মৃত হইয়া যাইবে কেন, কিম্বা না দাঁড়াইয়া বেচারামের রান্নাঘরেই ঢুকিয়া গেল না কেন! হতভম্ব হইয়া, যেন একটা অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায়, ঘটনাটা তার কিছুই মনে রহিল না—কেন সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছিল, পশ্চাতে কেহ বা কিছু আসিতেছে কি না!

তার হুঁস ফিরিল গুঁতা খাইয়া—অন্ধকার কাটিয়া গেল তখনই। যে—শিঙের আঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ হয় বলিয়া দিনকর দে'র বিশ্বাস, এবং সেই কারণেই শিং সম্বন্ধে ছিল তার বিশেষ আতঙ্ক, সেই শিঙের গুঁতা খাওয়া ছিল তারই বরাতে! কিন্তু সেই শিঙের আঘাতে দিনকরের গা ফাটিয়া হা হইয়া গেল না—কারণ, তা' পাথরের নয়; তার স্থিতিস্থাপক মাংসময় সমস্ত দেহটা একবার ঘুরপাক খাইয়া মাটিতে গড়াইয়া গেল কেবল।

শরীরের যে-স্থানে আঘাতটা বসিয়াছিল সে-স্থানের অবস্থা কি এবং সেখানে ব্যথা কত তাহা পরে দেখা যাইবে; কিন্তু সম্প্রতি তার দেহ মাটিতে গড়াইয়া পড়িবার পরও পুনরায় সেই শিঙের আঘাতেই আরো কি ঘটিতে পারিত তাহা অনুমান করা যায়, এবং অনুমানও করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।……মানুষটা চোখের সামনেই অপঘাতে মারা পড়ে দেখিয়া গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গাড়ী থামাইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল……এবং অন্যান্য কয়েকটি লোক সাবধানে দূরত্ব বজায় রাখিয়া বিপন্ন

দিনকর দে'র রক্ষাকল্পে যে চীৎকার সুরু করিয়াছিল, দিনকর প্রাণ-সংশয় অবস্থায় মাটিতে পড়িবার পর তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—

তাদের চীৎকারের লক্ষ্য শঙ্কর নিশ্চয়ই ; কিন্তু কেবল চীৎকার করিলে আর যে-আন্দোলনই সফলতার দিকে অগ্রসর হোক্, ষাঁড়ের বিরুদ্ধে তা নিষ্ফল—ক্রোধান্বিত বৃষের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির গতিরোধ তাতে হয় না।

ঠিক্ এই সময়টিতেই শশধর ছাতা হাতে করিয়া কর্ম্মস্থল হইতে ঘরে ফিরিতেছিল······

দিনকর দে'র ফাঁড়া কাটিয়া গ্রহের কোপ তখনো শান্ত হয় নাই—তখনো সে মাটিতে ; উঠিতে পারে নাই—

শঙ্কর পুনরায় প্রহারোদ্যত হইয়াছে—

হঠাৎ দিনকর দে'র ফাঁড়া কাটিয়া গেল—চক্ষের পলকে হাতের ছাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া শশধর লাফাইয়া আসিয়া পড়িল, যথাক্রমে ভূশায়ী আর উদ্যত শৃঙ্গ, দু'টি জীবের মাঝখানে······ দিনকরের দেহকে আড়াল করিয়া শঙ্করের শিং দু'টি সে দু'হাতের দুই মুষ্টির ভিতর চাপিয়া ধরিল······

দিনকর যে কেবল অবান্ধব আর অহিতৈষী নহে পরন্তু পরম শত্রু, নিদারুণ অবিচার করিয়া সে মারিয়াছে, শঙ্কর তা' ভোলে নাই, —সুতরাং সে বেজায় রুখিয়া রহিল, এবং শশধরকে যথাসাধ্য ঠেলিতে লাগিল। মারামুখো মানুষের রাগ পড়াইতে হইলে গা না, ঠেলিলেও চলে, সুবুদ্ধির নানারকম কথা কওয়া যায় ঢের, তা'তে

সুফলও পাওয়া যায়; কিন্তু শঙ্কর কথা বোঝে না—ইঙ্গিতে বিদ্রূপে তাহাকে বুদ্ধি দান করা অসম্ভব; কাজেই তাহাকে, খুনচাপা ষণ্ডকে, নিবৃত্ত করিয়া ফিরাইয়া দিতে শশধরকে শারীরিক যে বলপ্রয়োগ করিতে হইল, তাহা অনেকেরই মনে হইল অমানুষিক।

দশ

দিনকর দে সেদিন রক্ষা পাইয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের শিঙে অষ্টাঙ্গে ছ্যাঁচা খাইয়া পথের উপর তার অপমৃত্যু ঘটে নাই, শশধরের গায়ে জোর আছে বলিয়া। অসাধারণ শক্তিধর আর সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া শশধর বিখ্যাত আর মানুষের প্রীতির পাত্র হইয়া গেল। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে আর্ত্তরক্ষা করে তার চাইতে মহৎ আর কে! তাহাকে দেখিলে লোকের চোখ বিস্ময়ে একটু বড় হয়।

সুতরাং শশধর আছে ভাল। লোকের গুণমুগ্ধতার স্বাদ ভারি

তৃপ্তিদায়ক মধুর। তার উপর তরুণবৃন্দ তার পরম অনুরক্ত হইয়া তার শিষ্যত্ব সবিনয়ে গ্রহণ এবং গুরুত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। ইহাও সত্য যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি পায় গুরুগিরি করিবার সুযোগ পাইলে—উপরওয়ালা হওয়ার চাইতেও তা'তে সুখ বেশী।……ব্যায়াম চর্চ্চার শিক্ষানবিস্ কর্তৃত্বাধীনে পাইয়া শশধর অবিরাম পুলক অনুভব করে। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জল্পনাও সে শিষ্যগণের সহিত না করে এমন নয়।

ভুলিলে চলিবে না যে, শশধরের পুলকের দ্বিতীয় একটা কারণও আছে—সশরীরে উজ্জ্বল হইয়া অহোরাত্র সম্মুখেই আছে ……সে কারণটি তার স্ত্রী প্রফুল্ল। প্রফুল্ল অতিশয় প্রেমময়ী। তার প্রেমের প্রথম লক্ষণ ইহাই যে, সে বড় বিরহভীরু—একটি দিনের জন্যও স্বামীর কাছ ছাড়া হইয়া অন্যত্র যাইতে এবং থাকিতে সে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। এই একাগ্র আর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ-পিপাসা ভারি মধুর স্ত্রীর সেই অনিচ্ছাকে শশধর নিজ অর্জ্জিত একটা অমূল্য সম্পদ মনে করে। আবার সেই জন্যই মুস্কিলও বাধে।

সেবার প্রফুল্লর মায়ের অসুখের খবর আসিল—প্রফুল্লকে লইতে লোকই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রফুল্ল বলিল, বেশী বাড়াবাড়ির কথা ত' কিছুই বল্‌ছে না। না গেলেও চলে বোধ হয়। কি বলো?

শশধর বলিল, বোঝো তুমি। কিন্তু আমার মতে যাওয়াই উচিত। বুড়ো মানুষ অসুখে পড়েছেন।

—তা' হ'লে তুমিও চলো।

—আমি যাব কেমন করে? চাকরী কামাই করে?

—তবে আমিও যাব না। বলিয়া প্রফুল্ল গোঁ ধরিয়া রহিল·····

বলিল, খাওয়ার কষ্টে তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে।

শেষ পর্যান্ত সাত দিনের ছুটি লইয়া শশধরকে যাইতে হইয়াছিল, এবং ছুটি পাইতে তাকে মনিবের কাছে কষ্টকর অবনতি স্বীকার এবং মিথ্যা উক্তি করিতে হইয়াছিল বিস্তর।

ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিতে এই অনিচ্ছা ছাড়া আর একটা বিষয়েও প্রফুল্লর অনিচ্ছা দেখা যায়; কিন্তু বলিতে আমি বাধ্য যে, সেটা তেমন মধুর নয়।······আপন সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে সে জানে, এবং আপন সঙ্কল্পে সে দৃঢ় হইয়াই থাকিতে চায়—বিচ্যুত করিতে কেহ অগ্রসর হোক্, এ-ইচ্ছা তার নয়। তার এই অনিচ্ছাটা যেমন অটল তেমনি তেজী, তেম্‌নি নীরব—তাহাকে দুরূহ করিয়াও তোলে ঠিক তেম্‌নি।

প্রফুল্লর চেহারা বেশ—মুখখানা কচি কচি; কিন্তু সেই বালিকা-সুলভ পেলবতার মাঝেই কোথা হইতে একটা দুঃসাহসিক প্রবলতা স্ফুটিত হয়, তার হদিস্ শশধর পায় না······স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিবার দিকে প্রফুল্লর যথেষ্ট লক্ষ্য আছে, শারীরিক উৎসাহও প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়; কিন্তু অকারণেই আকাশস্পর্শী আশার সঙ্গে পর্ব্বতপ্রমাণ উদ্বেগ মিশাইয়া সে বহন করে না—সর্ব্বদাই কাঁটা হইয়া থাকে না। নির্ব্বোধ সে নয়—হাসিমাখা

প্রশ্রয় আর ক্ষমার ভাব তার আছে—শশধর এটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করে; কিন্তু তার আচরণের কুত্রাপি আতুরতা নাই—শশধর ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়া অস্বস্তি অনুভব না করিয়া পারে না।

সে যাহাই হউক, আনন্দের কথা এই যে, প্রফুল্লর স্বচ্ছতা, সুপরিচ্ছন্নতা আর সুষমা দেখিয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে কল্পনার পর কল্পনা করিয়া তাহাকে আরো সুন্দর আর অজানা গুণে ভরপুর করিয়া চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে মানুষের ইচ্ছা হয়।..... টাকা দিয়া নয়, পয়সা দিয়া নয়, কেবল অম্নিধারা অফুরন্ত সুমিষ্টতা দিয়া যে আকর্ষণ করিতে পারে তার সঙ্গলাভে যে-সুখ তা' কখনো নিঃশেষিত হয় না—বিস্বাদ হইয়াও ওঠে না। প্রফুল্লর বান্ধবী এবং হিতৈষিণী অনেক।

৫

একটি শিশু জন্মিয়াছে—

শিশু যে স্পর্শসুখ দেয়, তার অঙ্গে যে ঘ্রাণ থাকে তাহা, আর তার অজ্ঞান নির্ভরতা এবং তার মুখের অকারণ হাসি এ-পৃথিবীর সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না—অত রস মথিত করিয়া তোলা পৃথিবীর সাধ্য নয়। হাসিটা প্রফুল্লর খুব চতুর মনে হয়—বলে ছেলে খুব চতুর হবে।

শশধর বলে, জান্‌লে কেমন করে?

—ভারি দুষ্টুর মত হাসে—সবটা যেন হাসে না; হাসি লুকিয়ে একটুখানি হাসে।

শশধর অত তলাইয়া দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়া ভারি খুসী হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিশুটিকে পাইয়া ওরা যেন পৃথিবীর বাহির হইতে একটা অবলম্বন পাইয়াছে, এবং চমৎকৃত হইয়া আছে; মাঝে মাঝে আবার অবাক্ হইয়াও যায়—শিশুর মারফৎ দরিদ্রেরও এমন সৌগাৎ লাভ হইতে পারে, শিশু জন্মিবার পূর্ব্বে তাহারা তাহা জানিত না।

কিন্তু শশধরের মনের গতি অন্যদিকেও ধাবিত হয়—বলে, তোমার চাইতেও দীপক বলবান হবে;

প্রফুল্ল বলে, হ্যাঁ ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ।

শশধর জবাব দেয়, কিন্তু তুমি ত' রাক্ষসী নও। স্বামী বলবান্, এ-গর্ব্ব প্রফুল্লর আছে। বলে,—তা' না-ই বা হ'লাম। বাপ ত' ভীম।

দু'জনেই হাসে, আর দীপককে নাচায়।

এগার

ঐ প্রকারের সুখেই সংসার চলিতেছিল—হাসিমুখ সবারই। পাড়ার লোকের কাহার মনে গভীর গোপন দুঃখ আছে তাহা তল্লাস করিয়া কাজ নাই—বাহিরে অশান্তি উৎপাত কিছু ছিল না; কিন্তু হঠাৎ একদিন শান্তিভঙ্গ হইয়া অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল, শশধরের বা তার স্ত্রী প্রফুল্ল কিম্বা তাদের পুত্র দীপকের নয়—অন্য একটি লোকের। শশধর জড়াইয়া গেল তারই সঙ্গে—সেটাও শোচনীয়।

নিজের চেষ্টায় শশধর এখন শরীরে শক্তিশালী যতই হোক, যতই তার নাম ছুটুক, আর শিষ্য সেবক চেলার দল তার যতই জুটুক, আর তার দরুণ জীবন সার্থক হইল বলিয়া যতই সে মনে করুক, এ-সবের মূল্য দেয় লোকে নিরবয়ব উৎসাহ দিয়া, কৃতজ্ঞতার আনুগত্যে আর নির্ভর করিয়া। কিন্তু বই লইয়া বসিয়াও সরস্বতীর প্রতি যে অবহেলা একদিন সে দেখাইয়াছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল লক্ষ্মী—তিনি বিমুখ হইয়া

আছেন। শশধর দরিদ্র। সুতরাং বড় বড় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বা ভাড়া লইয়া বৃহত্তেরা যে-অঞ্চলে বাস করেন, এবং টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে বলিয়া মনে করেন, সেখানে তার প্রবেশপত্র পাওয়ার কথা নয়। দরিদ্র পল্লীর একেবারে অভ্যন্তরে না হোক্, একরকম তার গা ঘেষিয়াই সে বাস করে·····পাড়ার অনেক বাড়ীরই কান্না কলরব তারা স্পষ্ট শুনিতে পায়, সুতরাং তারা কাছেই থাকে বলিতে হইবে।

লোকগুলি দরিদ্র হইলেও তাদের মান ইজ্জৎ বজায় আছে—আত্মসম্ভ্রম কি পারিবারিক প্রতিষ্ঠা পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হোক, এ তারা চায় না, ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় তারা চঞ্চলই হয়।

হঠাৎ একদিন অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল, দূরবর্ত্তী কাহারো নয়, বা শশধরদের নয়, এই দরিদ্র পল্লীরই একটি দরিদ্র পবিত্র বাসিন্দার।

শিক্ষা ও রুচি হিসাবে অনুন্নত লোকের ভিতর শশধরের পদস্থ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক—তা'-ই সে আছে; সে কাছে আছে বলিয়া দুর্ব্বলেরা খানিক্ নির্ভয় হইয়া আছে, ইহাও সত্য—তারা তা' প্রকাশই করে; ডাকে 'বাবু' বলিয়া—'শশধর' বাবু নয়, খালি, 'বাবু'।

কিন্তু আশা ভরসা সবই একদিন বৃথা হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ নির্মেঘ, আর রাত্রি পূর্ণিমার। এই জ্যোৎস্না যে কি অপরূপ আর কত আনন্দকর তাহা বলিবার নয়—এই জ্যোৎস্নার আনন্দে বিহ্বল আর তার প্রাণময়তায় উদ্দীপিত আর

অভিষেক-অভিলাষী হইয়া বালকেরা মুক্ত স্থানে ছুটিয়া আসে ; লোকে নাম-কীর্ত্তনে বাহির হইয়া যেন বাঞ্ছিত পথে যাত্রা করে ; কবির চক্ষু নির্ণিমিষ হইয়া যায় ; শিশু সেই স্বর্ণ আলোকের উদ্দেশে হাত বাড়ায়…

কিন্তু এই অদ্বিতীয় রাত্রিতেই অতুলনীয় দুঃসহ যা তাহাই ঘটিল।

আজকে তেমন গরম নাই—দূরে কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে বোধ হয়, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে…পল্লী নিদ্রিত। নিদ্রিত পৃথিবীর উপর জ্যোৎস্নার এই প্রলেপ-প্রবাহ নিদ্রিত ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না—কিন্তু দেখিয়া ঘুমাইয়াছে—সেই দেখার সুখ তার ঘুমের ভিতর আছে—সেই সুখ ঘুমে গাঢ়তর হইয়াছে।

প্রৌঢ় নকুল মণ্ডল এই দরিদ্র পল্লীর দরিদ্রতম ব্যক্তি—অতিশয় অমায়িক। তার স্ত্রীও শান্তশিষ্ট লোক — প্রফুল্ল তাকে ভারি আনুকূল্য করে…

এই রাত্রে তাহারা ও নকুলের বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নকুলেরই বাড়ীর মাটির প্রাচীরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল পাঁচ ছ'টি লোক…তাদের একজন ডাকিল, নকুল ?…নির্ভয়ে আর অবাধ কণ্ঠেই সে নকুলকে আহ্বান করিল—শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে যে, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলেও, এবং হাতে লাঠি থাকিলেও, লোকটি বা লোকগুলি ভাল—দুরভিসন্ধি কিছু নাই।

কিন্তু নকুল তখন খুব ঘুমাইতেছে – নিঃশব্দ নিশীথে শব্দ প্রবল শুনায় এবং বহুদূর যায় ; তবু এক ডাকেই নকুলের ঘুম ভাঙিল না।

…নকুলকে যে ডাকিয়াছে, নকুলের ঘুম ভাঙান তার চাই-ই; কাজেই সে ঘন ঘন কয়েকবারই নকুলের নাম হাঁকিল…

নকুলের ঘুম ভাঙিল—

সাড়া দিবার পূর্ব্বে, বিছানায় থাকিয়াই, সে কান খাড়া না করিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাইল, প্রাচীরের বাহির হইতে অস্ফুট হাসির শব্দও আসিতেছে…

কারা ওরা? দুপুর রাত্রে দরজায় আসিয়া গৃহস্বামীর ঘুম ভাঙাইয়া হাসিবার অর্থটা কি?…নকুলের চিরকালের ধারণা, সাবধানের বিনাশ নাই। মনে মনে খুব সজাগ আর সাবধান হইয়া নকুল বিছানার উপর উঠিয়া বসিল—

জবাব দিল, কে?

খুবই অসঙ্কোচে অদৃশ্য ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিল; বলিল আম্‌রাই।…অর্থাৎ ইহা জানা কথা যে, তারা নকুলের প্রীতির পাত্রই।—তারপর বলিল, দরজাটা খোলো দেখি একবার; ভারি জরুরী কাজ আছে।

তবু নকুল ভুলিয়া গেল না যে, সাবধানের বিনাশ নাই; অদৃশ্য লোকটির কণ্ঠের ব্যগ্রতায় সে বিস্মিতও হইল। নকুল ডাক্তার নয় যে বিপন্ন গৃহস্থ এমন অসময়েও তার শরণাপন্ন হইবে; চোরের ভাণ্ডারী ত' সে নয়ই; তা' সে হইলে, ঠিক্ এমনি সময়ে তার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করা আর ঘুম ভাঙান' স্বাভাবিক দেখাইত।…বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া নকুলের হঠাৎ মনে হইল এই কৌশল অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ বাড়ীর লোককে ডাকিয়া আনিয়া

দরজা খুলাইয়া, ডাকাত ডাকাতি করিয়া থাকে—ওরূপ ঘটনার কথা সে শুনিয়াছে। কিন্তু তার বাড়ীতে ডাকাত আসিবে কেন? এমন পণ্ডশ্রমের কাজ কি আর আছে।

ভাবিয়া নকুল আরও বিস্মিত হইল; বলিল, পাড়ার কেউ নয় তুমি। গলা চিন্‌লাম না। কে তুমি?

—দরজা খুললেই দেখ্‌তে পারে। চোর ডাকাত নাই।

ভরসা পাইয়াও দরজা খুলিতে নকুলের সাহস হইল না; বলিল, উঁ হুঁ।

—তবে আমরাই খুলে নিচ্ছি।—

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নকুলের মৃৎপ্রাচীরের উপরকার খড়ের ছাউনির উপর লাঠি এবং দরজার উপর লাথি পড়িতে লাগিল।…

সেই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল প্রফুল্ল এবং শশধরেরও।

প্রফুল্ল বলিল, শব্দ কিসের?

শব্দের দিকে কান পাতিয়া শশধর নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিল, শব্দ লাঠি এবং লাথির…তার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল… একটা মিথ্যা কথা বলিল; পাপ করিল; বলিল, বুঝ্‌তে পারছিনে।

কিন্তু না বুঝিয়া আর পারা গেল না অবিলম্বেই—

নকুলের পিতার আমলের আম কাঠের আর উইয়ে জীর্ণ দুর্ব্বল দরজা তুমুল শব্দে ভাঙিয়া পড়িল…

ঐ শব্দ ছাড়া পৃথিবীর এই স্থান-খণ্ড একেবারে নিঃশব্দ—

জনমানবহীন প্রান্তর যেন—সেই নির্জ্জন প্রান্তরে নির্জ্জন একটি গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশের এই সশব্দ উদ্যম চলিতেছে।

প্রফুল্ল ছিট্‌কাইয়া উঠিল—

শশধর বলিল, ডাকাত পড়েছে নকুলের বাড়ীতে।

প্রফুল্ল বলিল কিন্তু নকুলের ত কিছু নেই—বিধবা একটা মেয়ে আছে কেবল। বুঝতে পারছ না? ওঠো, শীগগির যাও। বলিয়া প্রফুল্ল শশধরকে দুহাতে ঠেলিতে লাগিল…

গত বৎসর ঠিক্ এমনি দিনে দূরের একটা খড়ের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল—সন্ধ্যার কিছু পর; শশধর তখন আহারে বসিতেছে। কোলাহল শুনিবামাত্র সম্মুখের বাড়া ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া শশধর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া একাই একশোজনের কাজ করিয়াছিল—আগুনের গ্রাস হইতে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল—দু'খানা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল প্রায় একাই।

তার গায়ে আগুনের আঁচের জ্বালা প্রায় দুই দিন ছিল; সেই জ্বালা নিবাইতে ঘোল আর ডাবের জল সরবরাহ করিয়াছিল পাড়ার লোকে।

কিন্তু আজ শশধর উঠিল না, শুইয়া রহিল…

একটি নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ কানে আসিল—আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া, জ্যোৎস্নালোক তামস তুহিনপুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া, এবং বোধ হয় অন্তরের দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হইল এবং মিলাইয়া গেল…তারপর গুরুভার দ্রব্যপতনের শব্দ হইল;

গুরুভার দ্রব্যটি বোধ হয় মনুষ্য দেহ…এবং তার পরই একটা পুরুষ-কণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল……

প্রফুল্ল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, যাবে না ?

—দরকার নেই। বলিয়া শশধর চোখ বুজিল। তার মুদ্রিত চক্ষু প্রফুল্ল দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিতে পাইলেও সে বুঝিতে পারিত না যে, শশধর চোখ বুজিয়া আলস্য উপভোগ করিতেছে না-নিজের জীবনের অতীত কাহিনীর একটি অধ্যায় সে সজীব মনের আড়ালে রাখিতেছে।

তারপর ওদিকে একটা ছুটাছুটি এবং দৌড়ধাপের শব্দ হইল এবং পরিসমাপ্তিতে শেষ শব্দ যাহা উচ্চতর আর তীক্ষ্ণ-তর হইয়া অবিরাম প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা ক্রন্দন—নকুলের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

নকুলের বাড়ীটাই ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী—ছোট একটি ভাঙা পড়ো বাড়ী এবং ছোট একটি পড়ো জায়গা মাত্র ব্যবধান।

প্রফুল্ল বলিল, এবং সে কথা বলিল কান্না দমন করিয়া—গেলে না যে ? কি ঘট্‌ল তা বুঝতে পারলে ?

নকুলের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে দস্যুসমাগম হয় নাই ইহা স্পষ্ট হইয়া গেছে।

শশধর বলিল,—হুঁ।

তবু গেলে না যে ?

শশধর কথা কহিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল।

বারো

মানুষের ঘুমের আরাম ভাঙিয়া দিয়া রাত্রি একসময় প্রভাত হইল। তারপর হইল সূর্যোদয়। রাত্রি প্রভাত হওয়ায়, এবং তারপর সূর্যোদয়ে আর কিছু সুরাহা না হোক্‌, সত্বরই জানা গেল যে, নকুল বিস্তর প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসবাস করে—'বিস্তর' এই জন্য যে, যে-জনতা তাহার গৃহের সম্মুখে সমবেত হইল তার অর্দ্ধেক লোকসংখ্যায় একটা হাট দিব্যি চলে। অতএব বুঝা গেল, জানিতে কাহারো বাকী নাই যে, নকুলের অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বিধবা কন্যা মৃণাল অপহৃতা এবং নকুল নিদারুণভাবে প্রহৃত হইয়াছে। নকুলের ভাঙা দরজার শূন্য স্থানটা লোকের চোখের জলে নয়, চোখের আলোকে ভরিয়া উঠিল···নকুলের তা' চোখে পড়িল না, কিন্তু ব্যাপার তাই-ই।

ইহা গরজের সত্য নয়, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চিরকালের প্রমাণিত সত্য যে, মানুষমাত্রেই পরের আপদে-বিপদে অনুকম্পায় কাতর হইয়া পড়িবেই—সেটা ঈশ্বরদত্ত সহজ প্রবণতা। সুতরাং নকুলের ভাঙা হাড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল, অর্থাৎ নকুলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দু'টি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে জানা গেলে নরেশ্বর পাইন ডাক্তার ডাকিতে গেল······

তা' ছাড়া সেই লোকারণ্য আরো সৎকার্য্য করিল ইহাই যে, এই পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া খুব মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত এবং বিধির বিধানে অসন্তুষ্ট হইল—পরদুঃখে মুহ্যমান হইল যত, নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান্ এবং আকুল হইল তত; এবং নকুলকে সাহায্য করিবার বা তার দুঃখমোচনের কোনো উপায় হাতের কাছে তখনই নাই দেখিয়া হতাশ হইল আরো তত, আরো ব্যাপকভাবে; আর বাক্যব্যয় যে কত করিল তাহার ইয়ত্তাই নাই। মানুষের বুকের শব্দে আগে নকুলের বুক, তারপর তার বাড়ী এবং তারপর ক্রমশঃ যেন ব্রহ্মাণ্ডই পূর্ণ হইয়া গেল·····

সকলেই অধিকতর হাহাকার করিল এবং করাঘাতে ললাট ফাটাইতে উদ্যত হইল এই জন্য যে, এতবড় কাণ্ডটা ঘটিল—এত কাছে ঘটিল—কিন্তু ঘুম ভাঙিল না! ইহাতে, অর্থাৎ নিজের নিদ্রার প্রগাঢ়তা কত মর্ম্মে তাহা অনুভব করিয়া সকলেই বিস্ময়ে বিশেষ অবাক্ হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকেই নিজের অদৃষ্টকে প্রাণপণে আর চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া ধিক্কার দিয়া দিয়া পরের চোখের সম্মুখে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল···

নকুলের পশ্চিম দিক্‌কার প্রতিবেশী ভাস্কর দত্তের ছ'মাস পূর্ব্বে ডা'ন কানে পুঁয হইয়াছিল—পুঁযপূর্ণ কানের উপর তুলা চাপা দিয়া আর দু'কান প্যাঁচাইয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া তাহাকে দিন সাতেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তখন বাঁ কান আগাইয়া দিয়া তাহাকে মানুষের কথা ধরিতে হইত এই মিথ্যা কল্পনার বশে যে, ডা'ন কাণে শব্দ প্রবেশ করিতেছে না—

সে অভ্যাসটি সে এখনো ছাড়িতে পারে নাই; কাজেই নকুলের কথা কাণে ঢুকাইতে নকুলের দিকে বাঁ কান আগাইয়া দিয়া সে জানিতে চাহিল, সমগ্র ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ঘটিয়াছিল?

তিন স্থানে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নকুল ক্ষীণস্বরে জবাব দিল, না, বিস্তর সোরগোল!

ভাস্কর সে ক্ষীণস্বর শুনিতে পাইল; কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, বিস্তর? কিছুই জান্‌তে পারিনি'।—বলিয়া পরম বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া সে অন্তদিকে তাকাইয়া রহিল...

তা' সে থাক্—

তাহাতে তাহাদের কাহারো অনিষ্ট কিছু ঘটিবে না, এবং ইহাও ঠিক্ যে, এইরূপ সব আলোচনা আর জিজ্ঞাসাবাদেও অনিষ্ট কিছু ঘটিতে পারে না; কিন্তু অনিষ্ট ঘটিতে পারে হঠাৎ সেইরূপই একটা উক্তি করিয়া বসিল উমা পণ্ডিত।

পাঠশালার পণ্ডিত এই উমা পণ্ডিত—নাবালকদের শিক্ষাগুরু সে। চিরকাল অপরিপক্কবুদ্ধি ছেলেগুলির সংশ্রবে থাকিয়া থাকিয়া সঙ্গপ্রভাবে তাহারও বুদ্ধি যেন কাঁচিয়া আসিতেছে—পণ্ডিতের উক্তি যাহার যাহার কানে গেল তাহাদের সকলেরই মনে হইল তা'-ই—তারা পণ্ডিতকে মনে করিল মূর্খ।

ব্যাপার এই যে, গোলমালের মধ্যে পণ্ডিত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে জানিতে চাহিয়াছে, কারা তারা?

শুনিয়া কয়েকজন না শুনিবার ভাণ করিল—জানা জবাবটা

মুখ দিয়া বাহির হইয়া না যায়; কিন্তু কুঞ্জ দাস পণ্ডিতকে ছাড়িল না—বিশ্রী কর্কশকণ্ঠে আর কটাক্ষে তৎক্ষণাৎ সে বলিল,— মূর্খ কোথাকার! জানতে চাইছ তারা কে? তুমি স্ত্রী কন্যা অবলা নিয়ে বাস করো না? শুনে' তুমি করবে কি? তাদের ধরে' এনে ফাঁসী দেবে? তোমার কি মাথা-খারাপ?

শুনিয়া উমা পণ্ডিত ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল—

এবং কুঞ্জ দাস চতুর্দিকে তাকাইতে তাকাইতে নিরাপদ স্থানে, অর্থাৎ নিজের বাড়ীর দাওয়ায়, যাইয়া উঠিল।

মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা বা পরামর্শ কিছু হইল কি না, হইলে তার স্বরূপ কি ইত্যাদি বিবরণ দিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, এবং নির্বান্ধব সংসারে সে বাস করে এই বাঙ্গলা মজুদের মনে জাগিল কি না, তাহাও উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের প্রয়োজন শশধরকে নিয়া—তার কিন্তু যা ঘটিল তা' আর এক রকম, এবং তা-ও নিদারুণ সন্দেহ না।

তের

গৃহলক্ষ্মীর প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য, দ্রুতগতিতে ঘর-দুয়ারে বাসি কাজ সারিয়া ফেলা তারপর অন্যান্য কাজ, যাই থাক চলিতে থাকে। প্রফুল্লও প্রতিদিন তা-ই করে। কিন্তু সে দিন দেখা গেল, প্রফুল্ল আদৌ কাজে হাত দেয় নাই, পরিচ্ছন্নতা আর প্রসন্নতা লইয়াই সে দিনের গৃহকর্ম্মে রত হয়, কিন্তু আজ পরিবারের কল্যাণের দিকে আদৌ তার লক্ষ্য নাই—যেন নড়িয়া বসিবার সাধ্য নাই, এমনি অসুস্থ নির্জ্জীবের মত সে এ[illegible]ও চুপ করিয়া বসিয়া আছে…তার চোখের পাতায় গাঢ় ছায়া—কোনো দিকেই তার দৃষ্টি নাই—ছেলিটিকে পর্য্যন্ত সে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না!

ওদিকে, বিপন্ন এবং অপদস্থ প্রতিবেশী তল্লাস লইবার উদ্দেশ্যে শশধর মুখ ধুইয়াই বাহির হইয়াছিল—উহা কর্ত্তব্য; কিন্তু সটান যাইয়া সেখানে উঠিতে পারে নাই। খানিক অন্যদিকে বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া শিহরিত কলেবর আর কলরবমগ্ন জনতার একপাশে যাইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইল?… জনতা তখন বারো আনাই অনুপস্থিত—চার আনা দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া আতঙ্ক, কোলাহল, সান্ত্বনা, বিশ্বাস, সতর্কতার ইত্যাদি ভাব-বৈচিত্র্যের জের টানিয়া চলিয়াছে।

"এই যে, শশধর বাবু! কিছু টের পান্‌নি?"

কে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিল, বোধ হয় হঠাৎ আগত হৃদকম্প আর হতবুদ্ধিতাবশতঃই শশধর তাহা জানিতে পারিল না, কিন্তু সম্বিতে অনুভব করিতে তার বাকি রহিল না যে, সে টের পাইলে এই সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটিতে কিছুতেই দিত না, প্রশ্ন কর্ত্তার তা-ই আশা।

শশধরের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

নিরুত্তর থাকিতে সে পারিল না—নিরুদ্দেশেই সে বলিল, কিছুই টের পাইনি।...বলিয়াই তার মনে হইল, তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই; তাহার দেহের গৌরব মিথ্যা আর সে ভণ্ড, অকর্ম্মণ্য—এই ইঙ্গিত করিয়া সকলেই যেন হাসিতেছে!

কেহই হাসে নাই—নিজের কথাতেই সকলেই মত্ত, যাইবার জন্য ব্যস্ত; যাহার প্রশ্নের এবং যাহাদের নীরব ঔৎসুক্যের জবাব সে দিয়াছে তাহাদেরই কাণে কথা প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ...কিন্তু বিখ্যাত হইবার কষ্ট শশধর অনুভব করিল এই প্রথম।

শশধর পলায়ন করিল—মনে মনে গা-ঢাকা দিয়াই সে অধোমুখে পলায়ন করিল।

ঐ একটি প্রশ্নের সূত্রেই তারপর শশধরের একটু রাগ হইল...

আশেপাশে অনেকেই ত' ছিল! অনেকে একত্র হইয়া দাঁড়াইলে একটা শক্তি পুঞ্জীভূত আর দুর্ব্বার হইয়া ওঠে, এ কথাটা ওদের কেউ যেন জানে না। কেবল তার উপর নির্ভর করার কি মানে হয়?

চৌদ্দ

শশধর পলায়ন করিয়া বাঁচিল নয়, তখনকার মত নিজেকে চাপা দিল, কিন্তু তার দুর্গতি চরমে উঠিল বাড়ীতে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল প্রফুল্লকে; এবং তাহাকে অমন করিয়া অসুস্থের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে শঙ্কিত হইল খুব—স্নেহভরে জানিতে চাহিল, বসে' রয়েছ যে অমন করে'? শরীর খারাপ হয়েছে?

—না। বলিয়া প্রফুল্ল শশধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, দৃষ্টিকে যেন তার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, যেমন বিদ্যুৎ হঠাৎ অসতর্ক চোখের উপর অতর্কিতে তীক্ষ্ণ ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তেম্‌নি করিয়া।

শশধর অগ্রসর হইতেছিল স্ত্রীর শারীরিক কুশল জানিবার ব্যগ্রতায়—বাধা পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।···শশধরের মনে পাপ ছিল—দৃষ্টির অর্থটা সে বুঝিল। নকুলের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী জনতার ভিতর হইতে যে প্রশ্নটি এক ব্যক্তি তুলিয়াছিলেন, সে প্রশ্নটি দ্বিগুণ সজীব আর প্রফুল্লের দৃষ্টির আগুনে জ্বালাময় হইয়া উঠিল যেন···শশধর ভারি কুণ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু এবার পলায়নের পথ নাই। বুক কাঁপিয়া তার মনে হইতে লাগিল, কি আসিতেছে ওদিক্ হইতে।

আসিল বাক্য—প্রফুল্ল বলিল, তুমি এমন কাপুরুষ তা' জান্‌তাম না। আমি তোমার লজ্জায় তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে।

অপরাধের ক্ষয় বা ক্ষালন কিছুই হইতেছে না জানিয়াও শশধর নিজেকে সমর্থন করিল; বলিল, তুমি অবুঝের মত কথা বল্‌ছ। আমি কিছুই কর্‌তে পারতাম না।

—ঐ দেহ সত্ত্বেও? ভয় পেয়েছিলে তুমি কিসের? প্রাণের?

শশধর অনুভব করিল, প্রফুল্ল যেন বলিতে চায়, ঐ প্রাণের কোনো মূল্যই নাই।

শশধর বলিল, প্রাণের ভয় সকলের বড় ভয় সকল ভয়ের গোড়াকার ভয়, আর তা' সবারই আছে।

নকুলের বাড়ীতে শব্দ নাই—ওরা কাঁদিতে পারিতেছে না—ওদের জা'ত গেছে।···মেয়েটি এতক্ষণ···

প্রফুল্ল আর ভাবিতে পারিল না—ছট্‌ফট্ করিয়া সে উঠিয়া

দাঁড়াইল ; বলিল, সর্ব্বনাশের জন্তে দায়ী তুমি—তুমি পাপী।... তুমি যে যাওনি' এ অন্যায়টা আমি কিছুতেই কোনো কৈফতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পার্‌ছিনে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার। কেন গেলে না ?

—জীবন বিপন্ন ক'রেও লাভ কিছু হ'ত না।

—হ'ত। লাভ এত হ'ত যে, তা' কল্পনা কর্‌বার সাধ্যই তোমার নেই—থাক্‌লে যেতে।

শশধরের পুরুষত্ব দণ্ডিত হইতেছে, হউক ; স্বীকার না হয় করাই গেল, সে কাপুরুষ এবং দোষী ; কিন্তু তার কি বুদ্ধিও নাই ?

শশধর এবার ভ্রূভঙ্গী করিল—নির্ব্বুদ্ধিতার অপবাদের প্রতিবাদ সে করিবেই ; বলিল, কি লাভটা হ'ত শুনি ? আমিই না হয় বুঝিনে ; বুঝিয়ে দাও।

—একটি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বাঁচাতে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছ, অর্থাৎ ধর্ম্মপালন করেছ, এই গৌরবই হ'ত পরম লাভ। লাভ হ'ত তোমার, আমার, আমাদের এই ছেলেটির, আর মানুষের।

অনু ক্রমগত এই লাভবানের তালিকার মর্ম্ম শশধর ভাল বুঝিতে পারিল না ; বলিল, অবিবেচকের মত বিপদ্ ঘাড়ে নেয়ার কোনো মূল্য নেই।

—অবিবেচকের মত ? ভীরু আর দুর্ব্বলই বিবেচক সেজে' বসে' থাকে, আর সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে।...মানুষ যে এখন তোমায় আঙ্গুল তুলে' দেখাইবে তা' বিবেচনা কর্‌তে পারো ?

আগে নমস্কার করত বীর বলে', এখন দেখাবে কাপুরুষ বলে'।

এ বড় কঠিন সম্ভাবনা—শশধর বাঁচিয়া আছে ঐ রসেই ডুবিয়া; কিন্তু মুখে খাটো হওয়া এখন চলিবে না।—যেন নির্ভয়ে সত্য কথা উচ্চারণ করিতে তার মত সক্ষম ব্যক্তি আর কেহই নাই, এমনি একটা বিশাল আর গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া শশধর মিথ্যা কথা বলিল; বলিল, গ্রাহ্য করিনে।

শুনিয়া প্রফুল্লের চোখে হঠাৎ জল আসিতে চাহিল, কিন্তু জল আসিতে সে দিল না; সূচ্যগ্রের মত অত্যন্ত সূক্ষ্ম শাণিত একটু হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটাইয়া সে বলিল,—আমাকে গ্রাহ্য করো ত'? আমিও তা-ই বল্‌ছি তোমাকে।…মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গা-গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ! অমন নড়া ভূতেরও নড়ে, জানোয়ারেরও নড়ে—সম্ভ্রম বোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়—তা' তোমার নেই, আর তোমার জন্যেই মানুষের তা' নষ্ট হ'য়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছিনে।

শশধর কেন নারী অপহরণকারীকে বাধা দিতে দৌড়ায় নাই তার কারণ আছে, কিন্তু সে কারণটি প্রফুল্ল জানে না; প্রফুল্ল তার বিরুদ্ধে যত কিছু অভিযোগ, আর সাধারণ নীতি সম্বন্ধীয় তার যাবতীয় উক্তি ও মন্তব্য শশধর সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকারই করে, প্রকাশ না করিলেও স্বীকৃতি তার জীবনের উপলব্ধিতেই আছে; তথাপি ধিক্কারে ব্যথিত হইয়া শশধরের মনে হইল, যে ব্যক্তির অক্ষত দেহ

বজায় থাকার আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষাই নারীর ত্রাণের আর সম্মিতের আর মর্ম্মের এক মাত্র কথা, অর্থাৎ অবলম্বন, সেই প্রিয়তম ব্যক্তি কেন প্রাণ দিতে দৌড়ায় নাই, প্রাণটি হাতে করিয়া লইয়া যাইয়া উৎসর্গ করে নাই, কেবল তাহাই জানিতে চাহিয়া এত কথার সৃষ্টি যে-স্ত্রী করে এবং মেজাজের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করিতে চায় তাহার মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং প্রীতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে হতাশ হইতেই হইবে। প্রফুল্ল কেন বলিতেছে না: যাও নাই ভালই করিয়াছ; দুর্ব্বৃত্তগণের সঙ্গে মারামারি করিয়া তোমার কি ঘটিত বলা যায় না।···শশধরের কারো মনে হইল, দৃষ্টিটাকে আরো গভীর স্থানে প্রেরণ করিলে হয়তো ইহাই চোখে পড়িবে যে, স্ত্রীর মনে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল।

সুতরাং শশধর ক্রোধ প্রকাশ করিল; বলিল, আমি তোমার মত বিদ্যেসাগর নই।

—তা' জান্‌তে বাকি নেই। কিন্তু গায়ের জোরের অহঙ্কার ত' আছে!···ছেলেরা আসে—তাদের কাছে নিজের কৃতিত্বের পসার করতে ঢের শুনেছি। শক্তির উপকারিতার আর বল-হীনতার অসুবিধা আর কষ্টের কথাও বলেছ অনেক—শক্তিহীন আর মৃত দুই প্রায় একই রকম অকেজো বস্তু, এ-ও বলেছ। শক্তির প্রধান ব্যবহার আত্মরক্ষায়, তা'-ও তোমার মুখে শুনেছি। কিন্তু সবই তোমার শূন্য ঢেঁকির আওয়াজ। যখন চরম বিপদ আর আত্মরক্ষার সময় এল তখন তুমি রইলে শুয়ে; কারণ, তখন মুখের আস্ফালন কাজে লাগবে না।...তোমার তরুণ ভক্তেরা

তোমার কি মনে করবে এখন? তাদের সামনে মুখ তুলতে পারবে?...এ তোমার সাময়িক ভীরুতা নয়, তোমার মজ্জাগত চিরদিনের ভীরুতা। তোমার কোনো মূল্য নেই।

অসহ্য সত্য উক্তি ইহা—

শশধর বসিয়া পড়িল; কাতর কণ্ঠে বলিল,—পাগল!

পাগল তুমি করে' তুলেছ।...মানুষের সাধারণ স্বধর্ম আর প্রাথমিক প্রবৃত্তির অভাব যার আছে তার স্ত্রী হয়ে নিজেকে ভারি অসহায় মনে করছি আমি। অমন অবস্থাতে আমাকেও ফেলে তুমি পালাতে এবং পালাবে। আমি শিউরে অবশ হ'য়ে গেছি—আমার বড় ভয় করছে। বলিয়া প্রফুল্ল চোখ বুজিল। ভীতির কারণ এই সংসারকে সে যেন দৃষ্টি এবং স্পর্শের সম্পর্কের বাহিরে রাখিতে চায়।

শশধর কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—অমন অবস্থাতে স্ত্রীকে ফেলিয়া সে পলায়ন করিত কি না তাহা যেন অনুমান করিতে পারিতেছে, কিন্তু অনুভব করিতে গেলে অসহনীয় অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।

সে ছাড়া আর কেউ জানে না সে যে, ভূতের ভয় যেমন তার আছে, গাড়ীর চাকার দিকে তাকাইতে যেমন তার ভয় করে, তেমনি আছে তার লাঠির ভয়, অব্যর্থ। গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে আসিতে হইলে সে চোখ বুজিয়া বাহির হয়—চলন্ত গাড়ীর দিকে পিছন্ ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর লাঠি যখন দুরাচারি আর রক্তপিপাসু হইয়া ছুটিয়া আসে

তাহার সম্মুখে সে যাইতে পারে না—সে সাহস তার নাই। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত বৃষকে আর অসহ্য ব্যাধিকে সে বুক দান করিতে পারে।

অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যেই শশধর মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—লাঠির ভয় তার ঘুচিয়াছে—

বলিল, না, পালাবো না। আমার ভয় গেছে।

শেষ